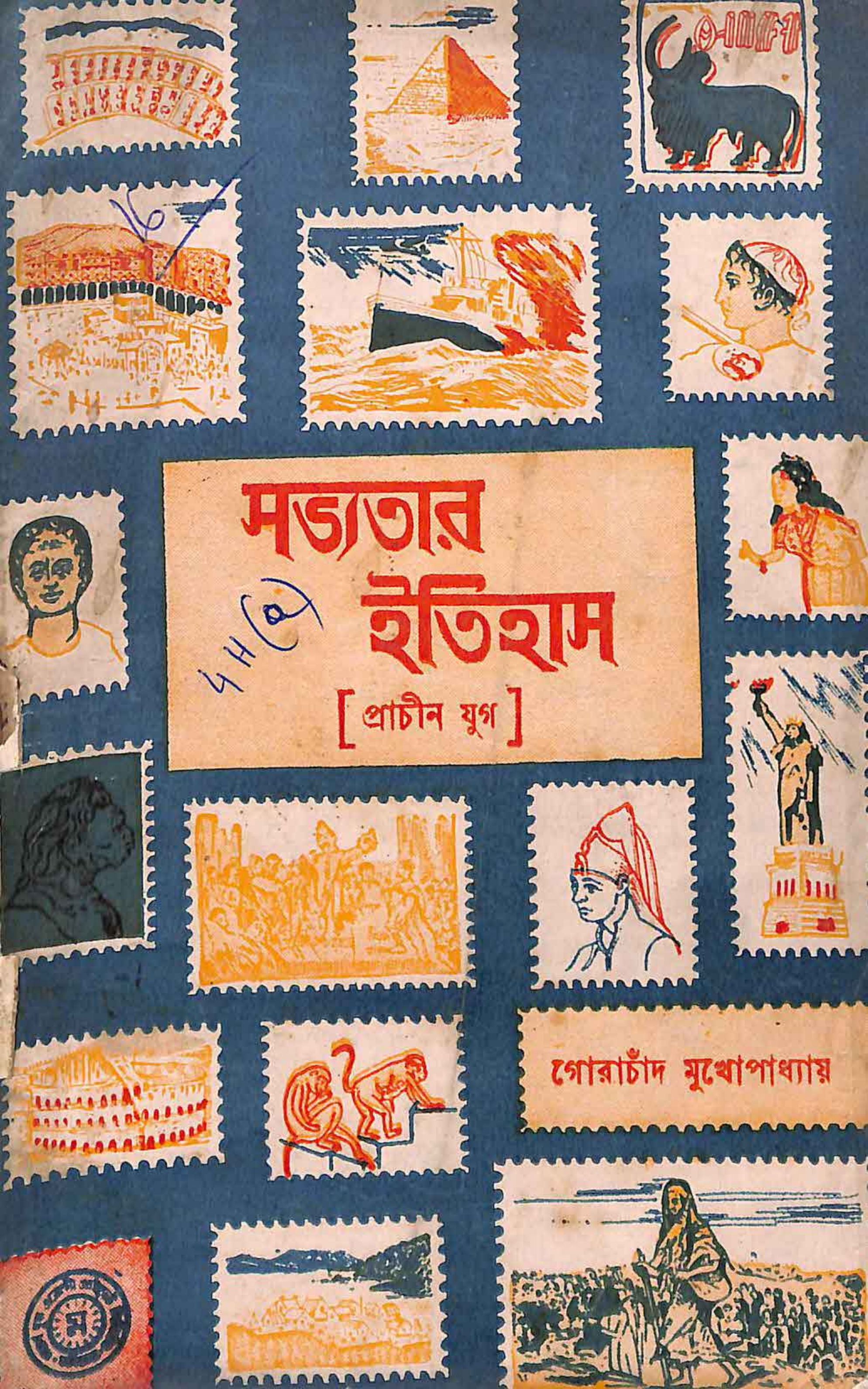


সভ্যতার ইতিহাস

[প্রাচীন যুগ]

গোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায়

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Textbook on History for Class VI for all Schools of West Bengal and Tripura.
[Vide T. B. No. VI/H/79/113, dated 5.12.79.]

সভ্যতার ইতিহাস

[প্রাচীন যুগ]

(ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য)

গোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায়, এম. এ.
ইতিহাসের অধ্যাপক, নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা—৭০০ ০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি. এ.
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম সংস্করণ : ১৯৭৯
দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ১৯৭৯
তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী ১৯৮০
চতুর্থ পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ : নভেম্বর, ১৯৮১
পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩
ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪

মূল্য : নয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র।

[বাজার হইতে সংগৃহীত কাগজে মুদ্রিত।]

মুদ্রাকর :
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বাগ
নিউ নিরালা প্রেস
৪, কৈলাস মুখার্জী লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

SYLLABUS IN HISTORY
CLASS VI
HISTORY OF ANCIENT CIVILISATION

Pages No. of Lessons.

A. (i) Why we should read history ; (to be acquainted with human civilisation, its development) ... 1 1

(ii) How we come to know of ancient people ... 2 1

B. Early man.

Use of fire as early as 300,000 B. C. (by 'Peking Man')

Food gathering man. Old Stone Age : ... 1

Nature of tools and implements, their uses ... 1

New Stone Age (By 8000 B. C.)

Evolution of tools and implements

Man—a food producer ... 2

The Neo-lithic revolution consisted also of domestication of animals : invention of pottery (wheel), weaving (clothings), dwelling—stone houses with defences ; early transport, beginnings of community life in settlements, beliefs and arts (as evident from cave-paintings etc.) ; use of formal language as a means of communication ; worship of the Goddess of productivity. 6 4

(for 'B' as a whole)

C. Copper-Bronze Age :

Emergence of towns, changes in production—specialisation (various types of skill of artisans and craftsmen) ; commerce (exchange of commodities) ; some changes in social life—classes ; inter-tribal conflicts ; emergence of an early form of state.

Reasons of the growth of River-Valley Civilisations ... 4 3

D. The early civilisations (3000 B. C.—1500 B. C.)—Mesopotamia, Egypt, Indus Valley, China—in outlines :

(i) Mesopotamia ;

(a) Location and antiquity, earlier development of civilisation than in other areas

(b) Fertility of the soil crops

(c) Defence against floods

(d) Other occupations

(e) Achievements of Sumerians : impossing towers, mudbrick temples, fresco, stone-cutting, metallurgy, transport and trade, script ... 5 4

Pages No. of Lessons.

(ii) Egypt :

(a) Location and nature of the land ;
(b) The Pharaoh, the priest, script and scribes, tax collectors and 'soldiers' (workers) ;
(c) Trade :
(d) The Pyramids (Examples) ;
(e) Religious beliefs
(f) Chief occupations ... 7 6

(iii) The Indus Valley

(a) The discoveries (brief reference to locations and findings). (b) Town planning ; (c) Food and other articles of use ; (d) Crafts ; (e) Trade ; (f) Worship; (g) Light thrown by relics upon classification in society, ... 7 5

(iv) China :

(a) Valley of Huang Ho and Yangste-Kiang :
(b) China in early times.
(c) Myths (particularly of flood) ... 2 1

(v) Common features, in brief, of the riparian civilisations, with special reference to social and economic life.

E. The Iron Age Societies :

(a) Discovery and use of iron, its impact ;
(b) Main features of social and economic life ;
(c) Growth of Kingship. ... 2 2

I. (i) Babylon :

Farming and Commerce, Temples and Priests ; Learning and culture ; the code of Hammurabi—nature of society revealed by the Code ... 3

(ii) Egypt as an imperial power :
Colonies ; The power of priests ... 2

(iii) Iran :
Rise of Persia : Zoroaster ... 2

(iv) The Jews :
Hebrews in Egypt ; Hebrews-exodus under Moses—flight from slavery ... 12 2 (for 'I' as a whole)

II. Greece (only in broad outlines) :
An introductory note on the influence of Crete ; The Homeric Age, The city states, cultural inter-

সূচীপত্র

সভ্যতার ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

ইতিহাস কেন পড়িঃ আমরা সকলেই গল্প শুনিতে ভালবাসি। শুধু আমরাই নই, পৃথিবীর সকল দেশের লোক, বিশেষ করিয়া ছোটরা গল্প শুনিতে চায়। অনেক অনেক দিন আগেকার গল্প, বেশ কিছুদিনের পুরাতন কাহিনী বা হাল আমলের কথা বা কাহিনী এ-সবকিছু শুনিতে কে না ভালবাসে। ইতিহাস এই রকমই এক ধরনের কাহিনী। আরও মজার কথা হইল এই যে, ইতিহাস মানুষের কাহিনী, আমাদের একান্ত নিজেদের কাহিনী।

ইতিহাসের মূল বিষয়ই হইল মানুষ। মানুষ ও তাহার পরিবেশের পরিবর্তনের কাহিনীই হইল ইতিহাস। আমরা এখন যে-বৈদ্যুতিক আলোতে কাজ করিতেছি, যে-সকল যন্ত্রে বই ছাপান হইতেছে, রেডিও, টেলিভিসন, রেলগাড়ি, বিমান, এমন কি বিশাল বিশাল অট্টালিকা বা প্রশস্ত রাস্তাঘাট এই সব কিন্তু একদিনে হয় নাই। মানুষ যেদিন প্রথম এই পৃথিবীতে আসিয়াছিল তখন এ-সবের কিছুই ছিল না। বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে বর্তমানের এই মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে। ইতিহাস তাই সভ্যতার এই ক্রমবিকাশের বিবরণী।

মানুষের অগ্রগতির প্রতিটি দিক্ লইয়া ইতিহাস। ইতিহাসপাঠ অপরিহার্য, কারণ ইহার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; যথা—সমাজবিদ্যা, রাষ্ট্রনীতি, ভূগোল, অর্থনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি।

ইহা ছাড়া ইতিহাস শুধুমাত্র মানুষের জয়যাত্রার কাহিনীই নহে, ইহা তাহার ব্যর্থতার কাহিনীও লিপিবদ্ধ করিয়া সেই ব্যর্থতার সঠিক কারণ কি তাহাও অনুসন্ধান করে। ইতিহাস তাই মানবজাতির সুসময় তথা দুঃসময়ের বিবরণী। ইহা যেমন আমাদের অনেক কাজে

উদ্বুদ্ধ করে, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে সতর্ক করিয়া দেয়। ফলে ঠিকমত ইতিহাস পাঠ করিলে নির্ভুলভাবে ভবিষ্যৎ গড়া সম্ভবপর। ইতিহাস পাঠ না করিলে মানুষের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

প্রাচীন যুগের লোকদের সম্বন্ধে জানিবার উপায়ঃ সুদূর অতীতে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা জানিবার উপায় কি? গতকল্য যাহা ঘটিয়াছে তাহা জানিবার উপায় কি? তাহা জানিবার উপায় দুইটি। হয়ত আমি নিজেই তাহা দেখিয়াছি; আর তাহা না হইলে যে দেখিয়াছে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি, কিংবা কাহারও নিকট সে-সম্বন্ধে কিছু শুনিয়াছি। সেইরূপ, যে-ঘটনা কয়েক বৎসর আগে ঘটিয়াছে তাহাও জানিবার সহজ উপায় আছে। যে-ব্যক্তি উহা দেখিয়াছে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই সে-সম্বন্ধে সব কথা জানা যায়। কিন্তু সুদূর অতীতে যাহা ঘটিয়াছে তাহা তো কোন জীবিত লোক চোখে দেখে নাই; সুতরাং তাহার সম্বন্ধে কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? সেই অতীত সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে আমাদিগকে অন্য পথ খুঁজিতে হইবে। তুমি হয়ত তোমার প্রপিতামহকে কখনও দেখ নাই। কিন্তু বাড়িতে তাঁহার ছবি থাকিতে পারে কিংবা তিনি যে-সব জিনিস ব্যবহার করিতেন সেগুলির মধ্যে কতক কতক থাকিতে পারে। সেই ছবি দেখিয়া বা সেই জিনিসগুলি দেখিয়া তুমি তোমার সেই পূর্বপুরুষের সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করিতে পার। তাঁহার ছবি দেখিয়া জানিতে পার তিনি দেখিতে কেমন ছিলেন, আর তাঁহার পোশাক-পরিচ্ছদ কিরূপ ছিল। তাঁহার বইগুলি দেখিয়া বলিতে পার, তিনি কোন্ কোন্ লেখকের বই পড়িতে ভালবাসিতেন এবং কোন্ কোন্ ভাষা জানিতেন। তাঁহার হিসাবের খাতাপত্র দেখিয়া বলিতে পার তাঁহার সময়ে জিনিসপত্রের দাম কিরূপ ছিল। বস্তুত, সেইসব দেখিয়া শুনিয়া সেকালের লোকেরা কিরূপভাবে বসবাস করিত সে-সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা জন্মাইতে পারে।

ঠিক এইভাবেই প্রাচীনকালের লোকেরা কিরূপ জীবন যাপন করিত তাহারও সম্বন্ধে আমরা একটি ধারণা করিতে পারি। অতি প্রাচীনকালের মানুষের কিন্তু কোন ছবি নাই। মাটি খুঁড়িয়া পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ঐ সব মানুষের মাথার খুলি ও অস্থি-পঞ্জর পাওয়া গিয়াছে। তবে ঐ সকল মানুষ যে-সব জিনিসপত্র তৈয়ারী করিত ও ব্যবহার করিত তাহার মধ্যে কতকগুলি আমরা দেখিতে পাই। কিরূপভাবে উহা দেখিতে পাই? প্রধানত মাটি খুঁড়িয়া মাটির ভিতর হইতে সে-কালের অনেক জিনিস পাইয়া থাকি। পণ্ডিতেরা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এইরূপ খননকার্য চালাইয়াছেন। এইভাবে তাঁহারা প্রাচীন যুগের অনেক অস্ত্রশস্ত্র পাইয়াছেন; গুহার দেওয়ালে আঁকা অনেক জীবজন্তুর ছবির সন্ধান পাইয়াছেন; মাটির পাত্র ও গহনা পাইয়াছেন এবং অনেক প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাইয়াছেন। এই সকল শহরে বিভিন্ন প্রকারের ঘরবাড়ি, কবর, মন্দির ও নর্দমা ছিল। যে-সব জিনিস মাটির ভিতর হইতে খুঁড়িয়া বাহির করা হয়, সেগুলি দেখিয়া পণ্ডিতেরা তাহাদের একটি আনুমানিক সন-তারিখ ঠিক করিতে পারেন এবং ইহা হইতে প্রাচীন ইতিহাসের সন-তারিখ সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা অনেকটা সুস্পষ্ট হইয়া থাকে।

মাটির ভিতর হইতে প্রাচীনকালের বিভিন্ন ধরনের লেখা, অনেক প্রাচীন লিপি পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীনকালের পাথরের দেওয়ালে, থামে কিংবা মন্দিরগাত্রেও অনেক লেখা দেখিতে পাওয়া যায়। এই লেখাগুলিকে বলে শিলালিপি।

প্রাচীনকালে এই সকল লোক যে-ভাষায় লিখিয়াছেন তাহা আমাদের ভাষা হইতে পৃথক্। কিন্তু পণ্ডিতেরা এই ভাষাগুলি পড়িতে শিখিয়াছেন এবং উহাতে কি লেখা আছে তাহা জানিতে পারিয়াছেন। তবে এমন অনেক লেখা আছে যাহা এখনও পর্যন্ত লোকে বুঝিতে পারে নাই। প্রাচীন রাজাদের টাকা-পয়সাও অনেক আবিষ্কৃত

হইয়াছে। এইগুলির উপরে রাজাদের নাম লেখা আছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তারিখও দেওয়া আছে। এই সব মুদ্রা ইতিহাস রচনার পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় উপাদান। বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেল প্রভৃতি প্রাচীন পুস্তকে প্রাচীন লোকদের সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। এখন যেমন ছাপান বই পাওয়া যায় আগে সেইরূপ ছাপান বই পাওয়া যাইত না। সেই সময়ে লোকেরা তালপাতা, চামড়া, মাটির টাইল প্রভৃতির উপর লিখিয়া রাখিত। মিশর দেশে পপাইরাসের উপর লেখা হইত।

অনুশীলনী

১। ইতিহাস বলিতে কি বুঝ? ইতিহাসকে কেন মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশের বিবরণী বলা হয়?

২। আমরা কিজন্য ইতিহাস পাঠ করি? ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা কি শিক্ষালাভ করি?

৩। প্রাচীন যুগের লোকদের সম্বন্ধে জানিবার উপায় কি?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন :

১। ইতিহাসের মূল বিষয় কি? কিভাবে সভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে?

২। ইতিহাস পাঠ অপরিহার্য কেন?

৩। ইতিহাস পাঠ না করিলে কি ক্ষতি হইবে?

৪। গতকল্য যাহা ঘটিয়াছে তাহা জানিবার উপায় কি? পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে কিভাবে জানিতে পারা যায়?

৫। প্রাচীন লোকদের অস্তিত্বের চিহ্নস্বরূপ কি কি আবিষ্কৃত হইয়াছে? তাহাদের ব্যবহৃত কি কি বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়?

৬। শিলালিপি বলিতে কি বুঝ?

৭। প্রাচীন ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে প্রাচীন মুদ্রার কি কোন গুরুত্ব আছে?

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। ইতিহাসের মূল বিষয়ই হইল —।

২। ইতিহাস পাঠ অপরিহার্য, কারণ ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে —।

৩। ইতিহাস তাই মানবজাতির — বিবরণী।

৪। — জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

৫। মাটি খুঁড়িয়া পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে — পাওয়া গিয়াছে।

৬। — প্রভৃতি প্রাচীন পুস্তকে প্রাচীন লোকদের সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

৭। মিশর দেশে — লেখা হইত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আদিম মানুষ

আদিম মানুষ ঃ সমস্ত মানুষের পূর্বপুরুষই ছিল বানর, কিন্তু বর্তমানে যে-বানর দেখিতে পাওয়া যায়, উহারা আমাদের পূর্বপুরুষ নহে। আজ হইতে প্রায় ছয় কোটি বৎসর পূর্বে মানুষ ও বানরের এক সাধারণ পূর্বপুরুষ ছিল, যাহা পরবর্তী কালে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এক দল ছিল লেজবিশিষ্ট ক্ষুদ্রাকৃতি বানর এবং অপর দল ছিল লেজহীন বৃহদাকারের বানর। এই দ্বিতীয় শাখাটি কালক্রমে বিবর্তনের ফলে মানুষের আকৃতি গ্রহণ করিয়াছিল।

আগুনের ব্যবহার ঃ আজ হইতে আনুমানিক তিন লক্ষ বৎসর পূর্বে এক ধরনের মানুষ এই পৃথিবীতে বসবাস করিত যাহারা গুহাবাসী হইলেও আগুনের ব্যবহার জানিত। কে প্রথমে আগুন আবিষ্কার করে তাহা কেহ জানে না। হয়ত কেহ দুইখানি শুকনা কাঠ ঘষিতে ঘষিতে প্রথমে আগুন জ্বালিয়াছিল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে পিকিং হইতে চল্লিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে চাউকাউতিয়েনের এক গুহায় একজন চীনা নৃতাত্ত্বিক পিকিং ম্যান বা সিনানথ্রোপাসের

প্রথম মুণ্ড আবিষ্কার করেন অতঃপর পূর্ণ উদ্যমে খননকার্য চালাইয়া প্রায় তিন ডজন অস্থি-পঞ্জরের সন্ধান মিলিল। এই সকল অস্থি-পঞ্জরের সহিত তাহাদের ব্যবহৃত জিনিসপত্রও পাওয়া গিয়াছিল। এইগুলির মধ্যে রহিয়াছে নানারকম অস্ত্র ও গুহায় ব্যবহৃত দগ্ধ হাড় ও ভস্মরাশি। এ-ছাড়া রহিয়াছে আগুন জ্বালাইবার এবং রন্ধন করিবার মত স্থান।



পিকিং ম্যান

খাদ্যান্বেষী মানুষ ঃ সেই সুদূর অতীতে মানুষ খাদ্য উৎপাদন করিতে জানিত না। খাদ্যের সন্ধানে তাহাদের নানাস্থানে ঘুরিতে হইত। বনে ও পাহাড়-পর্বতে ঘুরিবার সময় বনের ফলমূল সংগ্রহ করিত, নদীতে ও হ্রদে মাছ ধরিত এবং পশুপক্ষী শিকার করিয়া খাইত। জীবনযাত্রাও ছিল খুব কঠোর, কারণ বনের অন্যান্য জীবজন্তুর সহিত লড়াই করিয়া জীবনধারণ করিতে হইত। বন্য জন্তুগুলি ছিল স্বভাবতই বৃহদাকার এবং প্রচণ্ড শক্তিশালী, তাই বনে-জঙ্গলে খাদ্য আহরণ ছিল খুবই বিপদসংকুল।

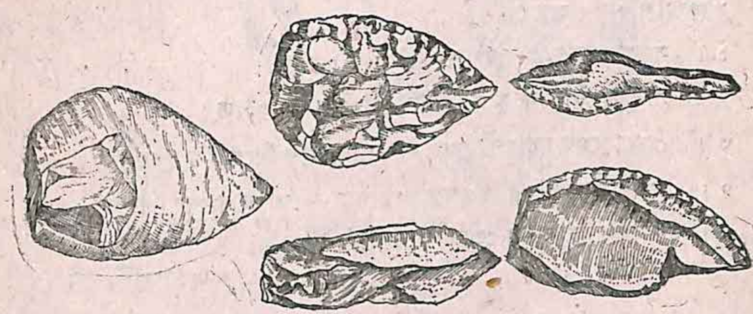
আদি প্রস্তরযুগ ঃ প্রাগৈতিহাসিক যুগের সূচনা হইয়াছে আদি প্রস্তরযুগ হইতে। এই যুগকে 'আদি' বলা হইয়াছে, কারণ ইহার ঠিক পরবর্তী যুগের মানুষরাও পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করিত কিন্তু সেগুলি ছিল উন্নত ধরনের। তাই এই দুই যুগের পার্থক্য নির্দেশ করিবার জন্য প্রথমটি আদি বা পুরাতন এবং পরবর্তী যুগ নূতন প্রস্তরযুগ বলিয়া পরিচিত।

আদি প্রস্তরযুগের লোকেরা পাথর দিয়া নানারকমের অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারী করিত। এই অস্ত্রশস্ত্রগুলি ছিল অমসৃণ, রুক্ষ ; কারণ পাথরগুলিকে যেমন পাইত তেমনি লইয়া ব্যবহার করিত। আদি

প্রস্তরযুগের শেষের দিকে পাথরকে নানাভাবে ভাঙ্গিয়া মসৃণ করিয়া নানাধরনের অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারী করা হইত। এগুলির মধ্যে পাথরের তৈয়ারী সূচ, ছুরি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রস্তরযুগের মধ্যবর্তী স্তরে নিয়ান্‌ডার্থাল মানুষের আবির্ভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জার্মানির নিয়ান্‌ডার্থাল উপত্যকার নামানুসারেই উহাদের এই নাম। পাথরের

অস্ত্রশস্ত্র

তৈয়ারী অস্ত্রশস্ত্র ইহাদের অনেকটা উন্নত ধরনের ছিল। উহারা লম্বা কাঠের উপরিভাগে পাথরের টুকরা বাঁধিয়া বর্শা তৈয়ারী করিত। এমন কি, বিশালাকৃতি এবং লোমশ হাতির ন্যায় বড় বড় জন্তুও ফাঁদে পড়িয়া তাহাদের নির্মিত বর্শার আঘাতে মারা যাইত। আদি প্রস্তরযুগে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র



আদি প্রস্তরযুগের অস্ত্রশস্ত্র

ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে, মধ্যপ্রদেশে এবং আরও কয়েকটি স্থানে পাওয়া গিয়াছে।

আদি প্রস্তরযুগে মানুষের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার হইল অগ্নি। এই আবিষ্কার মানুষের জীবনকে বহুমুখী ধারায় প্রবাহিত করিতে এবং সহজতর করিতে সাহায্য করিল। আগুনের দ্বারা লোকেরা শীতের সময় উত্তাপ লইত। তাহারা রান্না করিয়া খাইতে শিখিল এবং বন্যজন্তুকে আগুন জ্বালাইয়া ভয় দেখাইয়া তাড়াইতে লাগিল।

অনুশীলনী

১। আদিম মানুষ বলিতে কি বুঝ? কিভাবে পিকিং ম্যানের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল?

২। আদিম মানুষ কিভাবে খাদ্য সংগ্রহ ও জীবন যাপন করিত?

৩। আদি প্রস্তরযুগের বৈশিষ্ট্য কি ছিল? ঐ যুগের কোন্ কোন্ অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। পিকিং ম্যান কি আগুন জ্বালিত?

২। আদি প্রস্তরযুগ ও নূতন প্রস্তরযুগের তফাত কি?

৩। আদি প্রস্তরযুগের অস্ত্রশস্ত্র কিরূপ ছিল? এ-যুগের লোকেরা কিভাবে জীবন যাপন করিত?

৪। আদি প্রস্তরযুগের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার কি?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১। সমস্ত মানুষেরই পূর্বপুরুষ ছিল —।

২। প্রাগৈতিহাসিক যুগের সূচনা হইয়াছে — হইতে।

৩। প্রস্তরযুগের মধ্যবর্তী স্তরে — আবির্ভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৪। আদি প্রস্তরযুগের অস্ত্রশস্ত্র ভারতের — স্থানে পাওয়া গিয়াছে।

৫। আদি প্রস্তরযুগের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার হইল —।

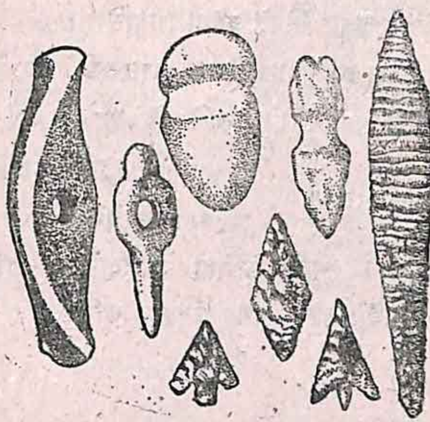
তৃতীয় অধ্যায়

নূতন প্রস্তরযুগ

উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ঃ কালক্রমে মানুষ পাথর হইতে ভাল ভাল অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারী করিতে শিখিল। তাহারা শুধুমাত্র পাথর ভাঙ্গিয়া অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারী করিত না; পাথরকে ঘষিয়া-মাজিয়া তাহার রুক্ষতা দূর করিয়া আরও কার্যকর অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারী করিতে পারিত। এইভাবে নূতন প্রস্তরযুগের সূচনা হইয়াছিল।

নূতন প্রস্তরযুগের প্রধান অস্ত্র ছিল কুঠার ও তীর-ধনুক। তীরগুলির মাথায় পাথর লাগান থাকিত। তাহারা বঁড়শি দিয়া মাছ ধরিত। কিংবা হার-পুন দিয়া বিদ্ধ করিত। এ-ছাড়া ঘরের প্রাচীরে পাখি-ধরা জাল রাখিত।

অস্ত্রশস্ত্র


নূতন প্রস্তরযুগের অস্ত্রশস্ত্র

নূতন প্রস্তরযুগের ধনুকের জ্যা দেখিয়া একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, তাহারা ফিতা বা দড়ি দিয়া আরও নানাধরনের অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারী করিতে পারিত। মাটি দিয়া তৈয়ারী ঢালের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং খুব সম্ভবত ফাঁপা কাঠের উপর চামড়া বসাইয়া ঢাল তৈয়ারী করিতেও জানিত।

নূতন প্রস্তরযুগের পাথরের কুঠার পূর্বাপেক্ষা আরও উন্নত ছিল। এগুলির প্রান্তভাগ ছিল বেশ ধারাল ও মসৃণ। আদি প্রস্তরযুগের হাত-কুড়ালের পরিবর্তে এইযুগে পাথর ছিদ্র করিয়া উহাতে হাতল লাগান হইয়াছিল। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পাথরের পরিবর্তে হাড়ের অস্ত্র ব্যবহৃত হইত। প্রস্তরযুগের শেষের দিকে প্যালেষ্টাইনের পাহাড় ও অরণ্যে এক ধরনের লোক বাস করিত। ওয়াদি-ওল-নাটুক নামক একটি স্থানে উহাদের ব্যবহৃত এক ধরনের পাথরের ক্ষুর, তীর-ধনুকের ফলা এবং পাথরের দাঁতওয়ালা বা জন্তু-জানোয়ারের হাড়ের তৈয়ারী কাস্তের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

আদি প্রস্তরযুগে মানুষ খাদ্য সংগ্রহের জন্য বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইত। বন্যজন্তু শিকার করিত কিংবা বনে যাহা আপনা হইতে

জন্মিত তাহা হইতেই সে খাদ্য সংগ্রহ করিত। ক্রমে ক্রমে মানুষ খাদ্য উৎপাদন করিতে শিখিল। নূতন প্রস্তরযুগের প্রত্নবস্তুর মধ্যে লাঙ্গল বা ঐ ধরনের কোন যন্ত্র পাওয়া যায় নাই। কাঠ দিয়া তৈয়ারী ঐ সকল যন্ত্র সম্ভবত বিনষ্ট হইয়া গিয়ছিল।

খাদ্য উৎপাদন-প্রণালী

নূতন প্রস্তরযুগের লোকেরা গম, বার্লি ও জোয়ারের চাষ করিত। শস্য শুধুমাত্র চাষ করিলেই হয় না, উৎপন্ন শস্যকে খাইবার উপযুক্ত করিয়া লইতে হয়। এজন্য শস্যকণাগুলিতে তাপ দেওয়া বা শিলনোড়া দিয়া পিষ্ট করিবার ব্যবস্থাও ছিল। শস্য তুলিয়া রাখিবার ব্যবস্থাও ছিল এবং দরকারমত তাহারা জমাইয়া-রাখা শস্য ব্যবহার করিত।

খাদ্য সংরক্ষণ

নূতন প্রস্তরযুগীয় বিপ্লব

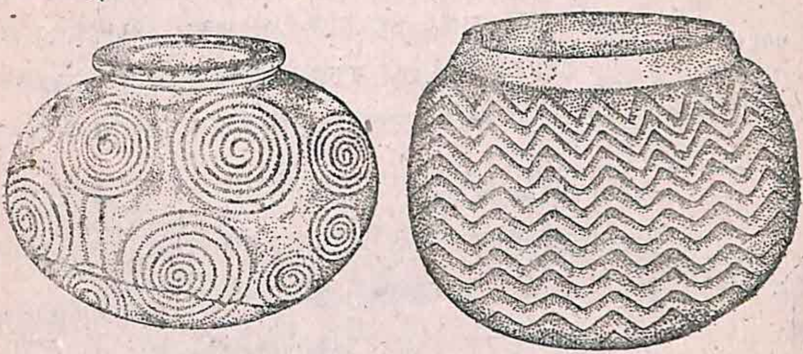
নূতন প্রস্তরযুগের মানুষ পূর্বেকার বন্য জীবন ত্যাগ করিয়া অনেকটা স্বাধীন হইয়াছিল। ইতিপূর্বে সে প্রকৃতির সম্মুখে বড় অসহায় ছিল। সে গুহায় বাস করিত এবং বনে-জঙ্গলে যাহা পাইত তাহাই খাইত। কিন্তু নূতন প্রস্তরযুগের মানুষ পরজীবী না হইয়া নিজেরাই ঘর তৈয়ারী করিতে শিখিয়াছিল, কৃষিজ উদ্ভিদ আয়ত্তে আনিয়াছিল। ফলে তাহাকে আর খাদ্যের জন্য স্থানান্তরে যাইতে হইত না। একখণ্ড জমি চাষ করিয়া সে সেইখানেই স্থায়িভাবে বাস করিতে পারিত। বস্তুত সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে নূতন প্রস্তরযুগের নানাধরনের কাজকর্ম ও চিন্তাধারার বিকাশকে বিপ্লব বলিয়া অভিহিত করা যায়।

আদি প্রস্তরযুগেই মানুষ কুকুরকে পোষ মানাইয়াছিল। কিন্তু কৃষিকার্য আয়ত্ত করিবার পর গৃহপালিত পশুর ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসিল। গরু, উট, ছাগল, হাঁস পোষা হইত। ইতিপূর্বে মানুষ খাদ্য হিসাবে জীবজন্তু

পশুপালন

পুষিত কিন্তু নূতন প্রস্তরযুগে কৃষিকার্য এবং দুগ্ধ সংগ্রহের জন্যও জীবজন্তু পোষা হইত।

ক্রমে মানুষ মাটি দিয়া নানারূপ পাত্র গড়িতে লাগিল। নূতন প্রস্তরযুগের লোকেরা খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখিত বলিয়া মৃৎপাত্রের



মৃৎপাত্র

মৃৎপাত্র

চাহিদা দেখা দিয়াছিল। সাধারণত বাড়ির মেয়েরা এই পাত্রগুলি গড়িত। ঝুড়ির উপর মাটির প্রলেপ লাগাইয়া উহাকে আগুনে পোড়াইয়া প্রথম প্রথম পাত্রের অভাব মিটাইত। ক্রমশ কুমারের চাকাও আবিষ্কৃত হয় এবং মৃৎপাত্রে কারুকার্য করিবার রীতি প্রচলিত হয়। এইরূপ কারুকার্য খচিত অনেক মাটির পাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে।

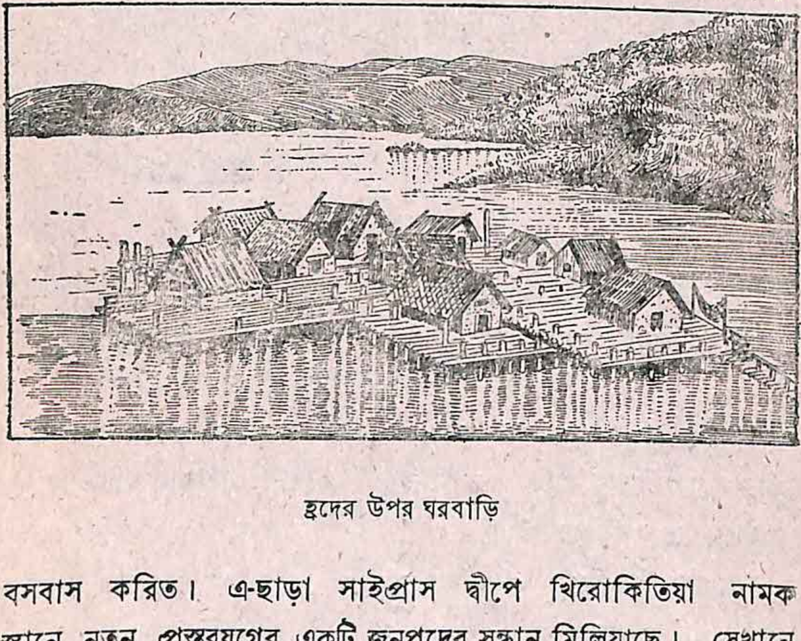
পোশাক-পরিচ্ছদ ও তন্তুশিল্প

তখনকার দিনে প্রধানত চামড়ার আচ্ছাদন ব্যবহৃত হইত, যদিও ইতিমধ্যে শণের তৈয়ারী বস্ত্রাদির ও শণের তৈয়ারী জালেরও প্রচলন হইয়াছিল। ক্রমশ তাহারা পশম ও শণ হইতে তৈয়ারী সূতা দিয়া কাপড় বুনিতে লাগিল। সম্ভবত মাকড়সার জাল প্রস্তুত-প্রণালী দেখিয়া মানুষ তাঁতের কাজ শিখিয়াছিল।

নূতন প্রস্তরযুগে ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলির মধ্যে সুইজারল্যাণ্ডের হ্রদের উপর ঘরবাড়ি বিশেষ

উল্লেখযোগ্য। বন্যজন্তু ও শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অনেকে হ্রদের অগভীর জলের উপর ঘরবাড়ি তৈয়ারী করিত। লম্বা, সরু খুঁটিগুলি হ্রদের তলদেশে বসান হইত। উহাদের অগ্রভাগ জলের অনেকটা উপরে থাকিত। এই খুঁটিগুলির উপরে সরু সরু ডাল ও তক্তা দিয়া মাচান করা হইত। সেই মাচানের উপর ঘরবাড়ি তৈয়ারী করা হইত। পার্বত্য উপত্যকা অঞ্চলেও কিছু লোক ঘরবাড়ি করিয়া

ঘরবাড়ি



হ্রদের উপর ঘরবাড়ি

বসবাস করিত। এ-ছাড়া সাইপ্রাস দ্বীপে খিরোকিতিয়া নামক স্থানে নূতন প্রস্তরযুগের একটি জনপদের সন্ধান মিলিয়াছে। সেখানে গম্বুজাকৃতি কতিপয় ঘরবাড়ি ছিল। চূণাপাথরের থামের উপর কাঠের কড়ি-বরগা ও কাদামাটি দিয়া নির্মিত এই ঘরগুলির অধিকাংশই ছিল দ্বিতলবিশিষ্ট। এশিয়া মাইনর, আফ্রিকা, কৃষ্ণসাগর অঞ্চল এবং পশ্চিম ও উত্তর-ইউরোপের অনেক স্থানে ও ইংল্যাণ্ডে নূতন প্রস্তরযুগে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ প্রভৃতিতে ব্যবহৃত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

পরিবহন ব্যবস্থা

মানুষ ক্রমে জঙ্গল কাটিয়া রাস্তা তৈয়ারী করিতে শিখিল। রাস্তায় মাল পরিবহনের জন্য চাকা-লাগান গরুর গাড়ি চলিত, নদীর ধারের শুষ্ক বৃক্ষাদি জলে ফেলিয়া দিয়া ঐ যুগের লোকেরা সেতু গড়িত। কুঠার দিয়া ফাঁপা বৃক্ষকাণ্ড ছেদন করিয়া উহারা এক ধরনের নৌকা নির্মাণ করিতে শিখিল। ইহা দ্বারা উহারা ছোট ছোট নদী ও হ্রদ পারাপার করিত। ক্রমে ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপযোগী নৌকাও প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিল।

জনজীবনের সূচনা

চাষবাস ও পশুপালনকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের সমাজ জীবনে এক ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল। খাদ্যের জন্য তাহাকে আর বন্যজন্তুর উপর নির্ভর করিতে হইত না। তাই যাযাবর শিকারীর জীবন ত্যাগ করিয়া মানুষ এখন হইতে একস্থানে স্থায়িভাবে বসবাস করিতে শুরু করিল, নূতন প্রস্তর-যুগের শেষের দিকে ধীরে ধীরে গ্রাম ও গ্রাম্য জীবনের সূচনা হইয়াছিল।

চিন্তাধারা ও শিল্প

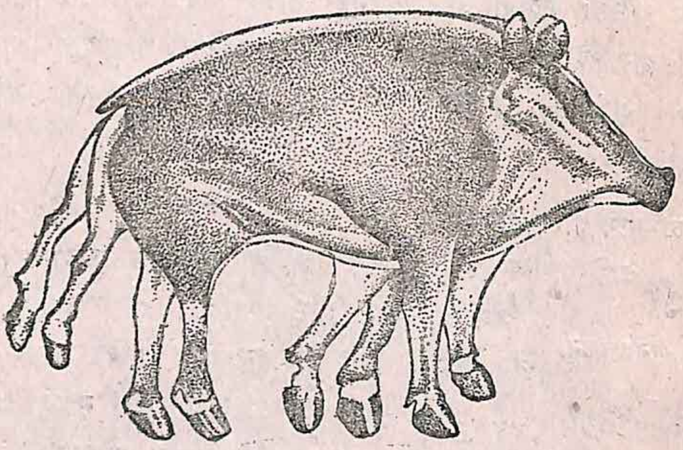
কৃষিকার্যের সাহায্যে সহজে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হইত বলিয়া মানুষ চিন্তা করিবার যথেষ্ট সময় পাইল। চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি দেখিয়া তাহারা চমৎকৃত হইত। এই শক্তিগুলি কি তাহা তাহারা বুঝিতে চেষ্টা করিল।

নূতন প্রস্তরযুগে নানাধরনের আবিষ্কার ও কারিগরি বিদ্যার বিকাশ হইয়াছিল, কিন্তু শিল্পীর প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি যাহা পুরাতন প্রস্তরযুগের গুহাচিত্রে পরিস্ফুট সেরূপ কোন নিদর্শন নাই। পুরাতন প্রস্তরযুগের লোকেরা গুহায় বাস করিত এবং এই সকল গুহার গাত্রে তাহারা নানারূপ জীবজন্তুর ছবি আঁকিত। স্পেনের আল্টামিরা গুহার দেওয়ালে বহু জীবজন্তুর ছবি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। এত বাস্তব

ও প্রাণবন্ত জীবজন্তুর ছবি পরবর্তী কালেও খুব কম দেখা গিয়াছে।

চারুকলা

নূতন প্রস্তরযুগের পাথরের উপর খোদাই করা ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শন আছে। কিন্তু তাহাদের তৈয়ারী অস্ত্রশস্ত্রগুলি মসৃণ এবং তাহাতে কোন কারুকার্য নাই।



আল্টামিরার গুহাচিত্র

সেই সুদূর অতীতে লোকে কি ভাষায় কথা বলিত? সম্ভবত উহারা অঙ্গভঙ্গী করিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিত। এ-ছাড়া বিপদে পড়িলে বিপদ সংকেত দিতে পারিত এবং জীবজন্তুদের নাম ধরিয়া বলিতে না পারিলেও তাহাদের চীৎকার বা হুঙ্কার অনুকরণ করিয়া একে অন্যকে বুঝাইতে পারিত।

ভাষা

প্রথানুযায়ী কথা বলা বা কোন কিছু ভাষায় প্রকাশ করিবার বিদ্যা মানুষ ধীরে ধীরে আয়ত্ত করিয়াছিল। পরস্পরের মধ্যে কথোপকথন বা কোন কিছুর বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিত না বলিয়া নূতন প্রস্তরযুগের মানুষেরা উহা নৃত্য করিয়া বা অভিনয় দ্বারা প্রকাশ করিত।

নূতন প্রস্তরযুগে ঈশ্বর আরাধনার ক্ষেত্রেও বিশেষ পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া যায়। তখনকার মানুষ খাদ্যোৎপাদন বাড়াইতে

চাহিয়াছিল এবং গৃহপালিত জীবজন্তুর বংশবৃদ্ধি কামনা করিত। ফলে প্রকৃতির স্বাভাবিক উৎপাদন-ক্ষমতা তখনকার মানুষের কাছে অধিক গুরুত্ব পাইয়াছিল। প্রকৃতিকে তাহারা উৎপাদন-ক্ষমতা-বিশিষ্ট মাতৃদেবী বলিয়া পূজা করিত। অস্ট্রিয়ার নিকটবর্তী স্থানে এইরূপ ভেনাসের মূর্তি এবং মোরাভিয়াতে মৃত্তিকা মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

উৎপাদন-ক্ষমতা-বিশিষ্ট ঈশ্বরের আরাধনা

অনুশীলনী

১। নূতন প্রস্তরযুগের মানুষ কোন্ কোন্ অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিত?

২। নূতন প্রস্তরযুগের খাদ্যোৎপাদন ও খাদ্যসংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৩। নূতন প্রস্তরযুগীয় বিপ্লব বলিতে কি বুঝ?

৪। নূতন প্রস্তরযুগের পশুপালন ও মৃৎশিল্প সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৫। নূতন প্রস্তরযুগের ঘরবাড়ি ও পরিবহন-ব্যবস্থা কিরূপ ছিল?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন :

১। নূতন প্রস্তরযুগের প্রধান অস্ত্র কি ছিল? আদি প্রস্তরযুগ অপেক্ষা ইহা কি উন্নত ছিল?

২। নূতন প্রস্তরযুগের আবির্ভাবকে বিপ্লব বলা হয় কেন?

৩। নূতন প্রস্তরযুগের লোকেরা কিভাবে হ্রদের উপর ঘরবাড়ি তৈয়ারী করিত?

৪। নূতন প্রস্তরযুগের লোকেরা কি গুহাচিত্র অঙ্কন করিয়াছিল? তাহাদের শিল্পকর্ম কিরূপ ছিল?

৫। আদি মানুষ কিভাবে কথাবার্তা বলিত?

৬। নূতন প্রস্তরযুগের পূজা-পদ্ধতি কিরূপ ছিল?

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। নূতন প্রস্তরযুগের মানুষ — ত্যাগ করিয়া অনেকটা — হইয়াছিল।

২। নূতন প্রস্তরযুগের শেষ দিকে ধীরে ধীরে — জীবনের সূচনা হইয়াছিল।

৩। স্পেনের — গুহার, দেওয়ালে বহু জীবজন্তুর ছবি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়

তাম্র ও ব্রোঞ্জ সভ্যতার যুগ

সূচনা ঃ নূতন প্রস্তরযুগের শেষের দিকে মানুষ একটি নূতন ধাতুর আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। সে তামার সন্ধান পাইল। কিন্তু তামা খুবই নরম ধাতু। সুতরাং তামার সহিত রাং মিশাইয়া ব্রোঞ্জ নামে একটি ধাতু তৈয়ারী করা হইল। প্রথমে অবশ্য হাতুড়ির সাহায্যে তামাকে পিটাইয়া পাথরের অস্ত্রশস্ত্রের মত অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করা হইত। এইজন্য প্রত্নতাত্ত্বিকগণ তাম্রযুগের প্রথম অবস্থাকে তাম্র প্রস্তরযুগ বলিয়া নামকরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে তাম্রযুগ হইতে ব্রোঞ্জযুগের সূচনা হইয়াছিল।

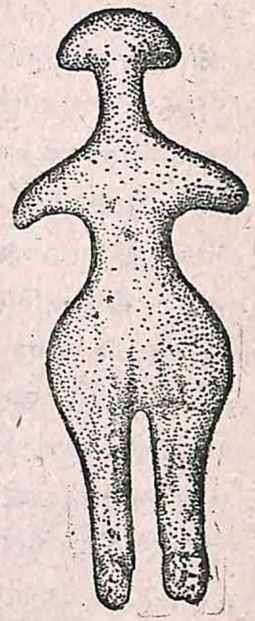
তাম্র ও ব্রোঞ্জযুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল শহর বা নগর সভ্যতার ক্রমবিকাশ। পশ্চিম-এশিয়ার টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী উপত্যকা, মিশরের নীল নদের অববাহিকা বরাবর এবং ভারতের সিন্ধু অঞ্চলে এই যুগের নাগরিক জীবনযাত্রার অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইতিপূর্বে মানুষ বসবাসের জন্য অপেক্ষাকৃত উচ্চস্থান পছন্দ করিত, কিন্তু এখন নদী মোহনায় এবং সমতলভূমিতে মানুষের বসতি আরও ঘন আকার ধারণ করিল। ইহার প্রধান কারণ হইল এই যে, নদী উপত্যকা অঞ্চলে কৃষিব্যবস্থা খুবই উন্নত ছিল। ইহা ছাড়া নদীপথে ব্যবসায়-বাণিজ্যের আদান-প্রদান হইত। ফলে নদী উপত্যকাকে কেন্দ্র করিয়া সেই সুপ্রাচীন যুগে বড় বড় জনপদ গড়িয়া উঠিয়াছিল।

নূতন প্রস্তরযুগে মানুষ কৃষিকার্যের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু নগর সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে উৎপাদন-ব্যবস্থারও পরিবর্তন অনিবার্য হইয়া পড়িল। এক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য ঐ যুগের কারিগর ও শিল্পীদের নানাধরনের শিল্পকৌশল। ব্রোঞ্জযুগের গোড়ার দিকে তামার জিনিসপত্রের খুব বেশী চলন ছিল না, চিরাচরিত

উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তন

পাথরের জিনিসপত্রই তখন বেশী ব্যবহৃত হইত। জীবজন্তুর হাড়ও ব্যবহৃত হইত। মৃৎপাত্র নির্মাণই ছিল এ-যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম, কারণ ধান-চাল, মদ, দুধ, প্রভৃতি ধরিয়া রাখিবার জন্য এগুলির তখন প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। কিন্তু এর-পর ক্রমশ ব্রোঞ্জের প্রচলন দেখা দিল, ফলে অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য জিনিসপত্র নির্মাণের জন্য ব্রোঞ্জ ব্যবহৃত হইত। গঠন বা কারু-কার্যের দিক্ হইতেও এগুলি বেশ উন্নত ধরনের ছিল। তরবারি, ছোট ছোট ছোরা, ঢাল, ছুরি, করাত, শিকল, পিন, কুঠার, কুঁজো, ব্রেসলেট, ব্রোচ্ প্রভৃতি নির্মাণের ক্ষেত্রে এ-যুগের শিল্পীদের কলাকৌশলের অপূর্ব নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।

শিল্পী ও কারিগর



ব্রোঞ্জ মূর্তি

এ-যুগের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তখন তামার খুব চাহিদা ছিল অথচ সব জায়গায় তামা পাওয়া যাইত না। মিশর, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি স্থানের ঘন-বসতি অঞ্চলের তামার চাহিদা মিটাইবার জন্য খুরাসান, স্পেন, অ্যায়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি দূরবর্তী স্থান হইতে তামা আমদানী করিতে হইত। এছাড়া চামড়া, অলিভ তেল, সোনা প্রভৃতি আমদানী করা হইত। বাণিজ্যিক শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বড় নৌকা এবং সাগরজলে চলিবার উপযোগী দাঁড় প্রস্তুত করা হইয়াছিল। কতিপয় বাণিজ্যিক পথও বাহির হইয়াছিল।

ব্যবসায়-বাণিজ্য

বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে পণ্যবিনিময় প্রথাই ছিল প্রচলিত বিনিময় মাধ্যম। এছাড়া স্বর্ণ, মুক্তা ও মূল্যবান প্রস্তরখণ্ডের বেশ চাহিদা ছিল। উহা দ্বারা

বিনিময়ের মাধ্যম

মিশরীয় বাজারে নামি-দামী কারিগরদের তৈয়ারী জিনিসপত্র ক্রয় করা যাইত।

সামাজিক পরিবর্তন ঃ ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক জীবনেও কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। ব্যবসায়ী ও শিল্পিগণ তাহাদের পণ্যসম্ভার বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে একস্থান হইতে অন্যত্র যাতায়াত করিত, এইভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা যখন কোন শহরে হাজির হইয়া সেখানে বসবাস করিত তখন স্বভাবতই তাহারা সেই অপরিচিত স্থানেও নিজেদের ধর্মাচরণ করিতে চাহিত। ফলে সেই সব শহরে বিদেশীদের পূজা-পদ্ধতি চালু হইয়াছিল এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের শিল্প ও কলাকৌশল ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই সব কারণে সমাজে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় ও ভাষাভাষী লোক একসঙ্গে বসবাস করিত। ফলে পূর্বেকার সমাজ-ব্যবস্থার মূল কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে। পূর্বে আত্মীয়তার বন্ধনই ছিল সমাজ জীবনের মূল ভিত্তি। কিন্তু এখন সে-রীতি পরিত্যক্ত হইল।

শ্রেণী বৈষম্য ঃ এ-যুগের শ্রেণী বৈষম্য ব্যবস্থা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তখনকার দিনে অনেক ধর্মীয় ভূ-সম্পত্তি ছিল। ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট সকলেরই ছিল সমান অধিকার। কিন্তু কার্যত পুরোহিত সম্প্রদায়ই এগুলি ভোগ করিত। ইহাতে কাজ করিয়া চাষী ক্ষেতমজুর বা ভূমিদাসেরা সামান্য মাত্র ভগ্নাংশ উপার্জন করিত। এদিকে তখনকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে অতিরিক্ত উৎপাদন হইত তাহা সামান্য কয়েকজনের কুক্ষিগত হইয়া পড়ে। ক্রমে সমাজে একশ্রেণী বিত্তশালী হইয়া উঠে এবং সমাজ-ব্যবস্থায় শ্রেণী বৈষম্য বৃদ্ধি পায়।

উপজাতীয় সংঘর্ষ ঃ তখনকার দিনের লোকদের সকলেরই ক্রয় ক্ষমতা ছিল না। ফলে শিল্পী ও কারিগরদের তৈয়ারী জিনিসপত্র মুষ্টিমেয় বিত্তশালীরাই ক্রয় করিত। শিল্পদ্রব্যের চাহিদাও এইজন্য যথেষ্ট সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। ফলে শিল্পসামগ্রী প্রস্তুত করিয়া অতি অল্পসংখ্যক লোকের গ্রাসাচ্ছাদন সম্ভব ছিল। বাকী সকলেই

চাষ করিয়া খাইত। সেই হেতু জলাভূমি ও মরুভূমির সমস্ত পতিত জমি উদ্ধারের কাজে সকলেই ব্যস্ত হইয়া পড়ে। ক্রমে জমি দখলকে কেন্দ্র করিয়া উপজাতীয় সংঘর্ষের সূচনা হইল। সুমের অঞ্চলের নগরগুলির মধ্যে এইরূপ পারস্পরিক সংঘর্ষের অনেক নিদর্শন আছে।

রাজশক্তির আবির্ভাব ঃ এই সকল উপজাতির কলহ মিটাইবার জন্য একটি সংস্থা গঠনের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। তাই ঐতিহাসিক যুগের সূচনাকালেই রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব ঘটে। এই রাষ্ট্রগুলি ছিল মূলত নগর-রাষ্ট্র এবং ইহার শাসকগণ নগরপাল নামে অভিহিত হইতেন।

নদী উপত্যকা অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য ঃ নানাকারণে নদী উপত্যকা অঞ্চলেই প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল। প্রথমত, এই অঞ্চলে সহজেই কাঁচামাল পাওয়া যাইত। দ্বিতীয়ত, ব্যাপক সমাজ-ব্যবস্থা গঠনের উপযোগী অবস্থাও নদী উপত্যকা অঞ্চলে ঘনবসতির অন্যতম কারণ। যোগাযোগের সুবিধা থাকায়, যৌথ উদ্যোগ চালাইয়া অনেকেই ভাল ফল পাইত।

নদী উপত্যকা অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যই ছিল নদীজলের প্রাচুর্য। স্থায়ী বসবাসের জন্য জল সরবরাহের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কারণ ইতিমধ্যে মানুষ ক্রমেই কৃষি-নির্ভর হইয়া পড়িয়াছিল। কৃষিকার্যে জলসেচ অনিবার্য। এছাড়া নদী উপত্যকা ভিন্ন অন্যান্য স্থানের অধিকাংশই ছিল শুষ্ক ও অনুর্বর। পক্ষান্তরে নদী উপত্যকা অঞ্চলে নানা জাতের ফলের গাছ ও আঙ্গুর ক্ষেতের প্রাচুর্যও মানুষকে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

নদী উপত্যকা অঞ্চলে বসবাস করিবার পক্ষে প্রধান অন্তরায় ছিল বন্যা, কিন্তু ইতিমধ্যে বাঁধ বাঁধিয়া ও খাল কাটিয়া নদী উপত্যকার লোকেরা নদীজল নিয়ন্ত্রণ করিতে শিখিয়াছিল। সেচের সুবন্দোবস্ত ছিল, ফলে সেখানে মানুষ চাষ-আবাদ করিয়া নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করিতে পারিত। তাছাড়া এখানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পাহাড়-পর্বত

ও মরু-অঞ্চল ভিন্ন অপরাপর স্থানে তৃণভূমির অভাব ছিল না। ফলে মানুষ পশুপালনেরও সুযোগ পাইয়াছিল।

অনুশীলনী

১। তাম্র ও ব্রোঞ্জযুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি ছিল ?
২। তাম্রযুগে উৎপাদন-পদ্ধতির কি পরিবর্তন ঘটিয়াছিল ?
৩। তাম্রযুগের ব্যবসায়-বাণিজ্য ও পরিবহন-ব্যবস্থা কিরূপ ছিল ?
৪। তাম্রযুগের সামাজিক পরিবর্তন ও শ্রেণী বৈষম্য সম্পর্কে যাহা জান লিখ।
৫। কি কারণে নদী উপত্যকাকে কেন্দ্র করিয়া প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। তাম্রযুগের প্রথম অবস্থাকে কি নামে অভিহিত করা হয় ?
২। পৃথিবীর কোথায় কোথায় তাম্রযুগের সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে ?
৩। তাম্র ও ব্রোঞ্জযুগের প্রধান শিল্পকর্ম কি ছিল ?
৪। ব্রোঞ্জযুগে বিনিময়ের মাধ্যম কি ছিল ?
৫। কি কারণে তাম্র ও ব্রোঞ্জযুগে উপজাতীয় সংঘর্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল ?
৬। তাম্র ও ব্রোঞ্জযুগে কিভাবে রাজশক্তির সূচনা হইয়াছিল ?
৭। নদী উপত্যকা অঞ্চলে স্থায়ী বসবাসের কি কি সুবিধা ছিল ?
৮। নদী উপত্যকায় বসবাসের পক্ষে প্রধান অন্তরায় কি ছিল ?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

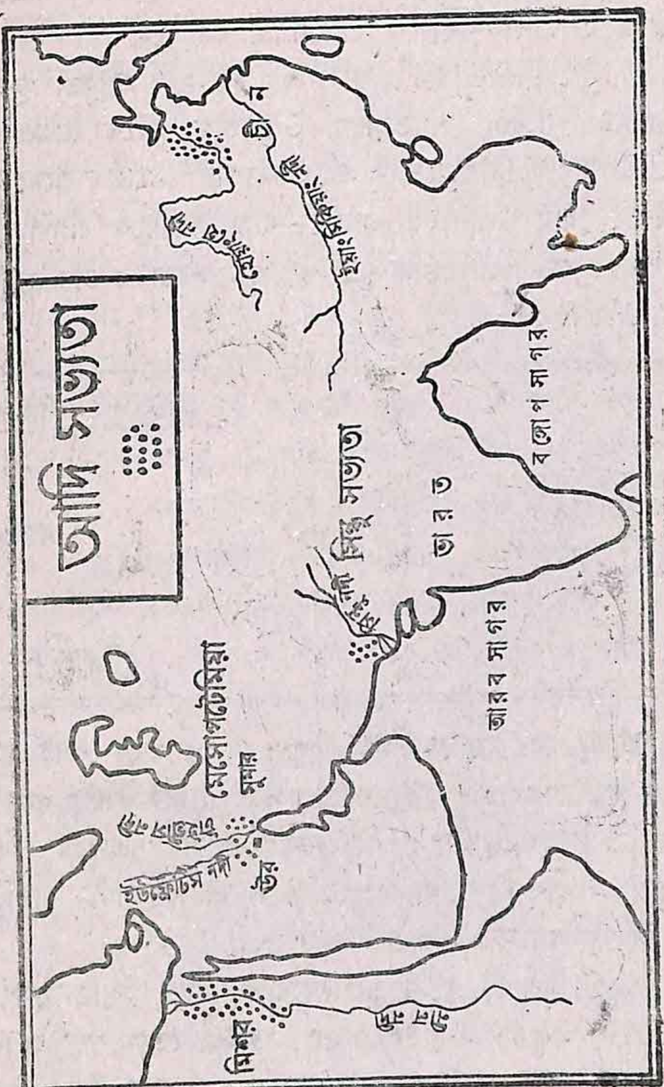
১। তাম্র ও ব্রোঞ্জযুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল — সভ্যতার ক্রমবিকাশ।
২। বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে—প্রথায় ছিল প্রচলিত বিনিময় মাধ্যম।
৩। ক্রমে — দখলকে কেন্দ্র করিয়া উপজাতীয় সংঘর্ষের সূচনা হইল।

পঞ্চম অধ্যায়

অতি-প্রাচীনকালের সভ্যতা

সূচনা ঃ নব্য-প্রস্তরযুগের শেষদিকে কিছু গ্রাম ও গ্রাম্য-শহর গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই গ্রামগুলি খুব তাড়াতাড়ি শহরে পরিণত হয়। যে-গতিতে এই ব্যাপক পরিবর্তন হইয়াছিল অনেকে তাহাকে 'বিপ্লব' বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন এবং এই সভ্যতাকে শহর-আশ্রয়ী-বিপ্লব (urban revolution) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুত

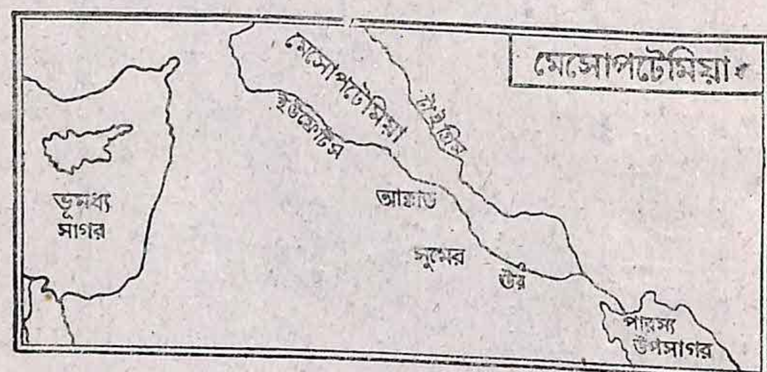
খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০০ হইতে ৩০০০ অব্দের মধ্যবর্তী সময়ে প্রথমে মেসোপটেমিয়া পরে মিশরে এবং ভারতের সিন্ধু অঞ্চলে প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ



হইয়াছিল। প্রায় একইভাবে চীনের হোয়াং-হো অঞ্চলে খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে এক সমৃদ্ধ নগর সভ্যতার পত্তন ঘটিয়াছিল।

(ক) মেসোপটেমিয়া

অবস্থান ও প্রাচীনত্ব ঃ পশ্চিম-এশিয়ার টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীদ্বয়ের উপত্যকা অঞ্চলকে প্রাচীন গ্রীকেরা মেসোপটেমিয়া নাম দিয়াছিল। মেসোপটেমিয়া কথাটির অর্থ দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ। ঐ নদীদ্বয় আর্মেনীয় পর্বতগ্রন্থির উপরিভাগ হইতে উত্থিত হইয়া পারস্য উপসাগরে মিশিয়াছে। এই উপত্যকার নিম্নভাগ সুমের নামে পরিচিত; ইহার উপরিভাগ আক্কাদ—যাহা উত্তরদিকে বাগদাদ পর্যন্ত প্রসারিত। সুমের ও আক্কাদ—এই দুই স্থান লইয়া প্রাচীন ব্যাবিলন গড়িয়া উঠিয়াছিল।



ঐতিহাসিকদের বহুদিন পর্যন্ত বিশ্বাস ছিল, মিশর দেশই মানব সভ্যতার প্রাচীনতম কেন্দ্র, কিন্তু বর্তমানে ইহা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মিশর সভ্যতার পূর্বেই মেসোপটেমিয়ায় সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে এই সুপ্রাচীন সভ্যতার অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

অতি-প্রাচীনকালেই সুমের এবং মেসোপটেমিয়ার সমৃদ্ধি সুবিদিত ছিল। কিন্তু মিশরের নীল উপত্যকার মত ইহা তেমন সুরক্ষিত ছিল না। ফলে মেসোপটেমিয়া বার বার বহিরাগত বিভিন্ন জাতির আক্রমণের সম্মুখীন হইয়াছিল। সবচেয়ে প্রাচীন যে-জাতি আসিয়া এখানে বসতি স্থাপন করে তাহাদিগকে সুমেরীয় বলা হয়।

সুমেরীয়গণ কোথা হইতে আসিয়াছিল এবং কোন্ জাতির লোক ছিল তাহা জানা যায় না। সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০০ অব্দে পূর্বদিক হইতে আগমন করিয়া উহারা পারস্য দেশের মধ্য দিয়া সুমের অঞ্চলে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। অবশ্য তাহাদের আগমনের পূর্বেই সুমের অঞ্চলের কৃষিকার্য বেশ উন্নত ছিল, ঘনবসতি ছিল এবং সেচব্যবস্থা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাও ছিল উন্নত মানের। ক্রমে সুমেরীয়দের আগমনের ফলে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং বর্ধিষ্ণু গ্রাম্য সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সকল গ্রামের আপন আপন দেবতা ও মন্দির ছিল। ক্রমে এই গ্রামগুলিকে কেন্দ্র করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রের উত্থান হইয়াছিল।

উর্বর মৃত্তিকা

সুমেরীয় লোকেরা খুব পরিশ্রমী ছিল। নদীমাতৃক সুমের ও মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের মৃত্তিকাও ছিল বেশ উর্বর। কারণ প্রতি বৎসর শীতকালে সেখানকার নদীর জল ফুলিয়া উঠিত এবং দুইকূল ভাসাইয়া দিত। এই জল যখন নামিয়া যাইত তখন সেই পলিমাটি-সমৃদ্ধ মৃত্তিকাতে চাষ করিয়া শস্য উৎপাদন করা সহজ হইত। তাই অনেকের মতে এই উর্বর মৃত্তিকাই হইল মেসোপটেমিয়া তথা সুমেরীয় সভ্যতার প্রাণ।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

সুপ্রাচীন কাল হইতে মেসোপটেমিয়ার লোকেরা বন্যা নিয়ন্ত্রণ করিতে শিখিয়াছিল। উহাদের সু-পরিকল্পিত ও উন্নত ব্যবস্থা আজও অনেকের বিস্ময় জাগায়। সেই সময়েই উহারা জলস্রোতাদি রোধের জন্য বাঁধ নির্মাণ এবং অতিরিক্ত জল নিষ্কাশনের জন্য খাল খনন করিয়াছিল। এমন কি, উহাদের প্রাচীন কাহিনী ও কিংবদন্তীতেও ভয়ঙ্কর বন্যা এবং উহা হইতে নিরাপত্তা লাভের উল্লেখ রহিয়াছে।

কৃষি-ব্যবস্থা

মেসোপটেমিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া বড় বড় খাল খনন করিয়া এবং কোথাও কোথাও বাঁধ নির্মাণ করিয়া জলসেচ ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা হইয়াছিল। ফলে সারা বৎসর প্রয়োজনীয় জলের অভাব না থাকায় সেখানকার উর্বর মৃত্তিকায়

অনেক ফসল জন্মিত। গম, বার্লি, খেজুর ও নানা জাতের তরিতরকারির প্রাচুর্য ছিল। অনেক পূর্ব হইতেই সেখানে গরু-চালিত লাঙ্গলের প্রচলন ছিল এবং সারি সারি বীজ বপনের জন্য এক ধরনের যন্ত্র ব্যবহৃত হইত। উহারা পাথরের দাঁত-বসানো কাঠের ঢেঁকি দিয়া শস্য মাড়াই করিত।

অন্যান্য কাজকর্ম

কৃষি ছাড়া অন্যান্য কাজকর্মের মধ্যে তাঁত বোনা, মৌমাছি পালন এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুত প্রভৃতিতে অনেক লোক নিযুক্ত ছিল। লোকে ব্যবসায়-বাণিজ্যও করিত।

অট্টালিকা ও মন্দির

মেসোপটেমিয়ার শহরগুলির মধ্যে উর, এরিডু, আক্কাদ, নিপ্পার প্রভৃতি বেশ প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিল। এই সকল শহরের মাঝখানে ধাপে ধাপে তৈয়ারী এক ধরনের মনোরম অট্টালিকা নির্মাণ করা হইত। এই অট্টালিকাগুলিকে সেই সময়কার ভাষায় 'জিগুরাট' বলা হইত। এগুলির শীর্ষে আর একটি পবিত্র স্থান বা মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে শীর্ষ মন্দির বলা যাইতে পারে। শীর্ষ মন্দিরে আরোহণের জন্য ধাপে ধাপে সিঁড়ির ব্যবস্থা ছিল। জিগুরাটের আকৃতি ছিল সমকৌণিক এবং এগুলি পোড়া ইট ও পাথর দিয়া গড়া। কিন্তু মধ্যস্থলে কিছু কাঁচা ইটের ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়।

অট্টালিকা ও মন্দির ছাড়া মেসোপটেমিয়ায় দুই ধরনের সমাধিও আবিষ্কৃত হইয়াছে—রাজাদের ও সাধারণ মানুষের। রাজাদের সমাধিতে এক বা একাধিক কক্ষ থাকিত এবং ঐ সকল সমাধি প্রস্তর বা ইষ্টক দ্বারা নির্মিত হইত।

চারুকলা

সুমেরীয়গণ চারুকলার ক্ষেত্রে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল। সেখানকার প্রাসাদ ও মন্দিরগাত্রের চিত্রাঙ্কন বড়ই সুন্দর। প্রাসাদের লাল রঙের দেওয়ালের বহির্ভাগে মৃত্তিকামূর্তি এবং অভ্যন্তরে রঙিন চিত্রাঙ্কন দেখিতে পাওয়া যায়। উর মহানগরীর একটি প্রাচীর গাত্রে মোজাইকের উপর মণিরত্নাদি খোচিত

ভাস্কর্য আছে। উহা দুই অংশে বিভক্ত। একভাগে সুমেরীয়দের যুদ্ধের ছবি—যেখানে রাজা যুদ্ধবন্দীদের পরিদর্শন করিতেছেন, অন্যটিতে রাজা তাঁহার বিজয় গৌরব জাহির করিবার উদ্দেশ্যে প্রজাদের সহিত পদযাত্রা করিতেছেন।

পাথরের কাজ : ধাতুর ব্যবহার

সুমেরীয় শিল্পিগণ পাথর কাটিয়া সুন্দর সুন্দর শিল্প-সামগ্রী প্রস্তুত করিত। রাজা ও রাণীদের সমাধিক্ষেত্র হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি-মাণিক্য প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহারা তামা ও রাঙের ব্যবহার জানিত, তবে ধাতুর খুব প্রাচুর্য ছিল না এবং সাধারণের কাছে উহা বিলাসদ্রব্যরূপে গণ্য হইত।

পরিবহন ব্যবস্থা

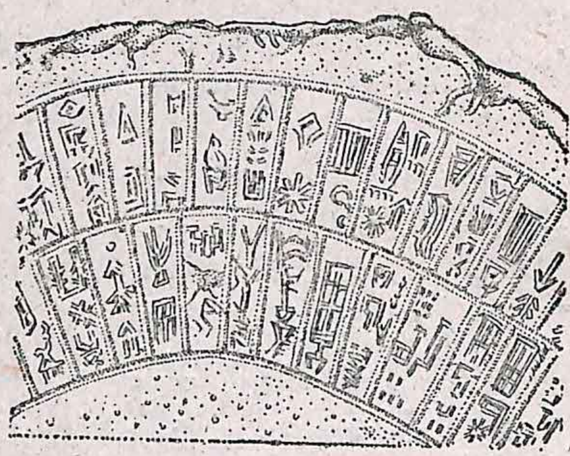
পরিবহনের ক্ষেত্রে জলপথই প্রধান ছিল, তবে ইতিমধ্যে স্থলভাগে পরিবহন ব্যবস্থা চালু হইয়াছিল। প্রত্নবস্তুর মধ্যে চাকা-লাগান কতিপয় গাড়ি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমেই ব্যবসায়িক লেনদেন চলিত। তবে মূল্যবান ধাতু হিসাবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের সমাদর ছিল। ধ্বংসস্তূপে প্রাপ্ত সীলমোহর পাঠ করিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, মিশর ও ভারতের সহিত সুমেরীয়দের যোগাযোগ ছিল।

ব্যবসায়-বাণিজ্য

সুমেরীয়গণ তাহাদের উদ্বৃত্ত পণ্যদ্রব্যাদি বিদেশে রপ্তানী করিত এবং বিদেশ হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র এবং মূল্যবান প্রস্তর প্রভৃতি আমদানী করিত। উত্তর, পূর্ব এবং পশ্চিমের দেশ-গুলির সহিত তাহাদের ব্যবসায়িক লেনদেন হইত এবং এমন কি, পারস্য উপসাগর ছাড়াইয়া সুমেরীয়গণ দূরদেশে ব্যবসায় করিতে যাইত। উহাদের তৈয়ারী পশমজাত বস্ত্রাদি এবং অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্যের বিদেশে বেশ কদর ছিল। এইগুলির বিনিময়ে উহারা বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করিত। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে প্রাপ্ত ব্যবসায়িক চিঠি-পত্রাদি, ক্রয়-বিক্রয়ের রসিদ প্রভৃতি দেখিয়া

তথাকার জীবনযাত্রার ব্যস্ততা উপলব্ধি করা যায়। ফলে একথা সহজেই অনুমান করা চলে যে, কৃষি-নির্ভর জনসমষ্টি ভিন্ন সেই সুপ্রাচীনকালের সুমের দেশের ব্যবসায়গোষ্ঠী সমাজে বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল।

সুমেরীয়গণ বহুদিন যাবৎ ছবি দিয়া লিখিত। ক্রমে ঐতিহাসিক যুগের শুরুতে উহারা লিখিবার এক নূতন প্রণালী আবিষ্কার



কিউনিফর্ম লিপি

করিয়াছিল। কতকগুলি ছোট-ছোট খোঁচা-খোঁচা রেখার সমবায়ে সবকিছু লেখা হইত। কাদার কাঁচা টাইলের উপর শরের বা কাঠের কলম দিয়া প্রথমে লেখা হইত। লেখা শেষ হইলে টাইলগুলিকে রৌদ্রে শুকাইয়া লওয়া হইত। এইগুলিকে কিউনিফর্ম লিপি বলে। এইভাবে লেখা বহু মাটির টাইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেগুলি হইতে আমরা সেকালের অনেক কথা জানিতে পারি।

লিপি

অনুশীলনী

১। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার অবস্থান ও প্রাচীনত্ব সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

২। মেসোপটেমিয়ার বন্যা-নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা ও কৃষিকর্ম সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩। মেসোপটেমিয়ার প্রধান অট্টালিকাগুলি কিভাবে তৈয়ারী করা হইয়াছিল ?

৪। মেসোপটেমিয়ার ধাতুশিল্প, চারুকলা ও পরিবহন-ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখ।

৫। মেসোপটেমিয়ার বাণিজ্যিক প্রসার সম্পর্কে আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন :

১। মেসোপটেমিয়া কি পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার জন্মস্থান ?

২। মেসোপটেমিয়ায় প্রথম কোন্ জাতির আবির্ভাব হইয়াছিল ?

৩। মেসোপটেমিয়ার মৃত্তিকা কিরূপ ছিল ?

৪। মেসোপটেমিয়ার লোকেরা কিভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করিত ?

৫। জিগুরাট বলিতে কি বুঝ ?

৬। সুমেরীয় লিপি কি নামে অভিহিত ? ইহা কিসের উপর লেখা হইত ?

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। পশ্চিম এশিয়ার — উপত্যকা অঞ্চলকে প্রাচীন গ্রীকেরা — নাম দিয়াছিল।

২। সবচেয়ে প্রাচীন যে-জাতি মেসোপটেমিয়ায় আসিয়াছিল তাহাদিগকে — বলা হয়।

৩। মেসোপটেমিয়ার শহরগুলির মধ্যস্থলে অবস্থিত সুবৃহৎ অট্টালিকাগুলিকে — বলা হইত।

৪। সুমেরীয়গণ — লিপি ব্যবহার করিত।

(খ) মিশর

অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি : আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্ব কোণে নীল নদের উপত্যকা অঞ্চল মিশর নামে পরিচিত। মধ্য-আফ্রিকাতে

উত্থিত হইয়া নীল নদ উত্তর দিকে প্রবাহিত হইয়াছে এবং পরিশেষে উহা ভূমধ্যসাগরে মিশিয়াছে। ইহার উপত্যকা অঞ্চল লইয়া মিশর দেশ। ইহা কোথাও অতি স্বল্প-পরিসর, কোথাও দশ মাইল চওড়া আবার কোথাও বা কুড়ি মাইল। ইহার দুই দিকে দুই সুবিশাল মরুভূমি। মিশরের ভূ-ভাগ প্রধানত শুষ্ক ও উত্তপ্ত, বৃষ্টিপাতও তেমন হয় না। কিন্তু প্রতি বৎসর জুন মাসে মধ্য-আফ্রিকার আবিসিনিয়ার হ্রদ হইতে আগত বন্যার জল নীল নদের উপকূল ভাগ প্লাবিত করিত, অতঃপর ডিসেম্বর মাসে এই জল আস্তে আস্তে যখন নামিয়া যাইত তখন নদী-বাহিত পলিমাটি মিশরের মৃত্তিকাকে সজীব ও উর্বর করিয়া তুলিত। এইজন্যই মিশরকে 'নীল নদের দান' বলা হয়।

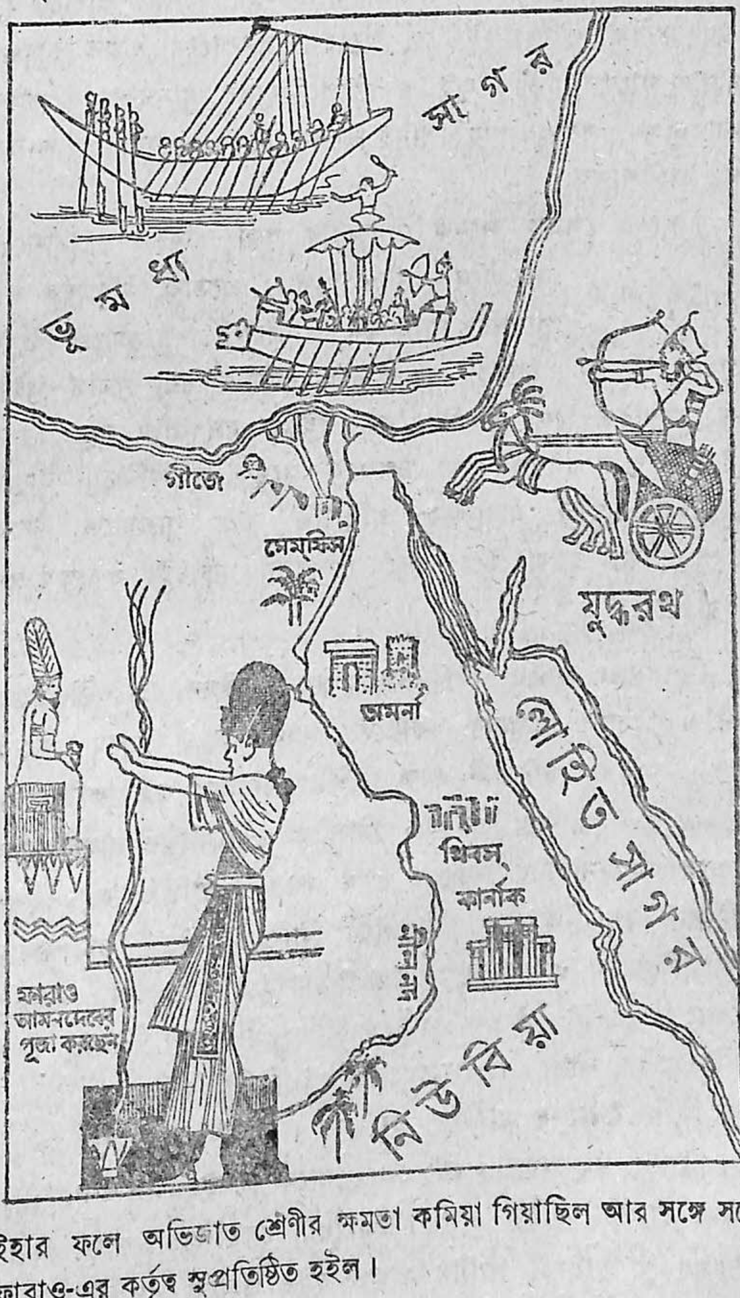


মিশরকে কেন নীল নদের দান বলা হয়

মিশরের রাজাকে 'ফারাও' বলে। মিশরীয়গণ রাজা ঐশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্ন বলিয়া মনে করিত। মিশরের ইতিহাসের সূচনা হইতেই রাজা ঈগল দেবতা হোরাসের অবতার। ফলে রাজার ক্ষমতার কোন সীমা ছিল না। তাঁহার কথাই ছিল দেশের আইন। প্রথম অবস্থায় দেশের জমিজমা ও মন্দিরগুলির অধিকাংশই ছিল অভিজাত শ্রেণীর কর্তৃত্বাধীন, কিন্তু

ফারাও

খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে সমগ্র দেশে এক চরম অরাজকতা শুরু হইয়াছিল।



ইহার ফলে অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতা কমিয়া গিয়াছিল আর সঙ্গে সঙ্গে ফারাও-এর কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

রাজার প্রধান কাজ ছিল দেশ শাসন করা। এজন্য তাঁহাকে এত কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত যে, তাঁহার শাসনকার্যের সহিত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বা ফ্রান্সের চতুর্দশ লুই ও নেপোলিয়নের শাসনকার্যের তুলনা করা চলে। যুদ্ধের সময় তিনিই ছিলেন দেশের কাণ্ডারী এবং শান্তির সময় প্রজাপালক।

পুরোহিত শ্রেণী

মিশরের লোকে অনেক দেবদেবীর পূজা করিত। দেবতাদের জন্য অনেক মন্দির ছিল। প্রত্যেক মন্দিরের জন্য পুরোহিত থাকিতেন। পুরোহিতদের সমাজে বিশেষ প্রাধান্য ছিল। তাঁহারা দেশবাসীর ধর্ম-বিশ্বাসের সুযোগ লইয়া ভয় দেখাইত যে, ভগবান রুষ্ট হইলে দেশবাসীর সমূহ বিপদ হইবে। ফলে লোকে পূজা উপলক্ষে অনেক ব্যয় করিত। ইহাতে পুরোহিত শ্রেণীর সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাওয়াতে উহারা ক্রমশ ধনবান হইয়া উঠে এবং দেশবাসী ক্রমেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

লিপি

মিশরীয়রা প্রথমে লিপিচিত্র, পরে চিত্রিত বস্তু উচ্চারণের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করিতে সমর্থ হয়। ক্রমে উহারা চব্বিশটি অক্ষরবিশিষ্ট বর্ণমালার সৃষ্টি করিয়াছিল এবং এইগুলি মিশরীয় ও ফিনিশীয় ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের প্রায় সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। বর্ণমালা বলা হইলেও মিশরীয় লিপিতে চিত্র ভিন্ন কোন অক্ষর ছিল না এবং অনেকেই উহা পাঠ করিতে পারিত না। কেবল পুরোহিত শ্রেণীই ঐগুলি পাঠ করিতে পারিত। এইজন্য এই লিপি 'ধর্মীয় লিপি' বা 'হায়েরোগ্লিফ্' লিপি বলিয়া পরিচিত। তখন লিখিবার কাগজ আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে নীল নদের তীরে লম্বা লম্বা নল-খাগড়া জন্মিত। লোকে সেই নল-খাগড়াগুলি চিরিয়া চ্যাপটা করিত এবং আঠা দিয়া সেগুলিকে জোড়া দিত। এইভাবে যে চ্যাপটা জিনিস প্রস্তুত হইত উহাকে 'পপাইরাস' বলা

হইত। মিশরের লোকেরা নল-খাগড়ার কলম দিয়া পপাইরাসের উপর লিখিত।

মিশরে দরকারী কাজকর্মে অনেক লেখালেখির কাজ হইত। তাই সেখানকার লেখকগণ সাধারণ লোক বলিয়া অবহেলিত হইত না। এক্ষেত্রে এ-কথা উল্লেখ করা দরকার যে, মিশরের সাধারণ মানুষ বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত যে-কেহই লিখিবার কাজ করিত তাহাকেই লেখক বলা হইত, কিন্তু উহাদের শুধু লেখক ভাবিলে চলিবে না। উহারাই দেশ শাসন করিত ও সবকিছুর হিসাব রাখিত। এমন কি, সামরিক বাহিনীও উহাদের কথায় উঠিত-বসিত। তবে এই সব কাজের যোগ্যতা অর্জনের জন্য ইহাদের কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত এবং অনেকদিন ধরিয়া শিক্ষানবীশের কাজ করিতে হইত।

লেখক শ্রেণী

মিশরের রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রেও লেখক সম্প্রদায়ের অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। উহারাই নীল উপত্যকার উপরিভাগ ও নিম্নাঞ্চলের জমিজমার কর নির্ধারণ ও আদায় করিত। প্রাচীনকালেই মিশরে নাইলোমিটার (Nilometer) আবিষ্কৃত হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে নদীজলের উচ্চতা মাপিয়া মিশরীয় কর আদায়কারিগণ বিভিন্ন অঞ্চলে কিরূপ শস্য উৎপন্ন হইবে তাহার ভবিষ্যৎ বাণী করিতে পারিত। সেইমত ভিন্ন ভিন্ন এলাকার জন্য পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কর নির্ধারিত হইত।

কর আদায়কারিগণ

মিশরের লোকেরা প্রধানত কৃষিকর্ম ও প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত থাকিত। সেখানে খুব পরিশ্রমী চাষীর অভাব ছিল না, কিন্তু যোদ্ধ-শ্রেণীর যথেষ্ট অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সেই-হেতু প্রাচীন রাজবংশের আমল হইতে মিশরের সৈন্যবাহিনী বলিতে বিদেশী ভাড়াটিয়া সৈন্যদের বুঝাইত। এদিকে মিশরীয় মন্দিরের দেওয়ালে তখনকার দিনের শ্রমজীবীদের কাজকর্মের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রমজীবীদের বেশীর ভাগই স্বাধীনভাবে

সৈন্য ও শ্রমিক

আপন আপন কাজকর্ম করিত। এই কাজে ক্রীতদাসেরাও নিযুক্ত ছিল। বৃত্তিভিত্তিক শ্রেণীভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল।

মিশরীয়দের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নীল নদই ছিল প্রধান বাণিজ্য পথ। নুবিয়া ও সুদানের সহিত সে

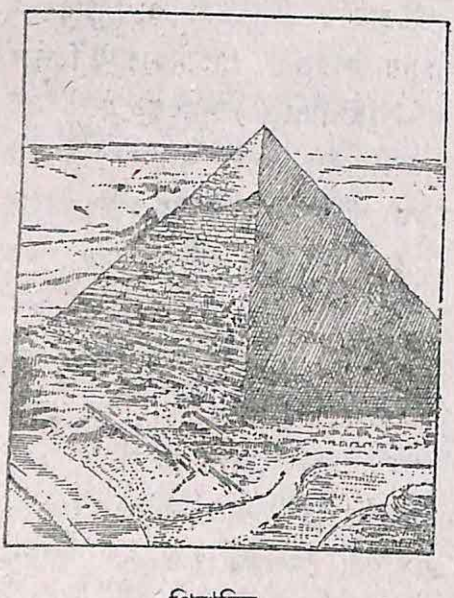
ব্যবসায়-বাণিজ্য

স্বর্ণ, গজদন্ত, আবলুস কাঠ, অস্ট্রিক পাখীর পালক ও দাস-ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল। মিশরের বাণিজ্যতরী লোহিত সাগরেও চলাচল করিত এবং দক্ষিণে জাঞ্জীবার ও পূর্বে পারস্য উপকূল পর্যন্ত এই বাণিজ্য সম্প্রসারিত হইয়াছিল।

মিশরীয় শিল্প ও স্থাপত্য সত্যই বিস্ময়কর। উহারা দেবতার জন্য সুন্দর সুন্দর মন্দির গড়িয়াছিল। এগুলির মধ্যে কার্নাকের মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কিন্তু মিশরীয় সভ্যতার প্রধান

পিরামিড

উল্লেখযোগ্য জিনিস হইল উহাদের পিরামিড। মিশরের রাজারা বড় বড় কবর নির্মাণ করিতেন। এই কবরগুলিকে বলে পিরামিড। এগুলিকে সমাধিমন্দিরও বলা চলে। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২৯০০ অব্দে গিজা প্রান্তরে রাজা খেঅপস্ বা খুফুর বিখ্যাত পিরামিডের গঠনকার্যের সূচনা হয়। মোট ১৩ একর এলাকার উপর ৭৫৫ ফুট দীর্ঘ এই পিরামিডই হইল মানুষের তৈয়ারী সবচেয়ে বড় কাঠামো।



পিরামিড

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর একটির পর একটি সাজাইয়া পিরামিড গড়া হইত। সম্ভবত

পিরামিডের চারিদিকে কাঠের গুঁড়ির উপর পাথর চাপাইয়া ধাপে-ধাপে সেগুলি টানিয়া উপরে উঠান হইত।

প্রাচীন মিশরের প্রধান দেবতা ছিলেন রে বা সূর্য-দেবতা। পরে যখন থিবসের সাম্রাজ্য স্থাপিত হইল তখন থিবসের দেবতা অ্যামন মিশরের প্রধান দেবতা হইলেন। উহারা হোরাস বা ঈগল দেবতাকে স্বয়ংসম্ভূত বলিয়া মনে করিত। এছাড়া ছিল রে দেবতার পুত্র ওসাইরিস্। তিনি ছিলেন নীল নদের দেবতা। ইসিস্ নাম্নী স্ত্রী-দেবতারও উল্লেখ পাওয়া যায়। মিশরীয়দের

ধর্মীয় বিশ্বাস



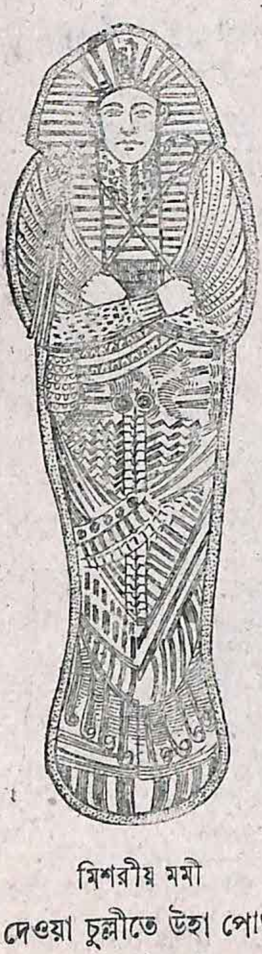
মিশরের দেবদেবী

বিশ্বাস ছিল যে, প্রত্যেক দেবতা মানুষের কাছে কোন বিশেষ প্রাণীর আকারে নিজদিগকে প্রকাশিত করেন। তবে মিশরীয়দের ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে উহাদের পরলোকচর্চা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উহারা

মনে করিত যে, মানুষের মৃত্যুর পর তাহার আত্মা জীবিত থাকে। যতদিন পর্যন্ত মৃতদেহ রক্ষা করা হয় এবং উহার জন্য খাদ্য ও পানীয় রাখা হয় ততদিন পর্যন্ত সেই আত্মা সেই দেহে বাস করিতে থাকে।

মামী

এইজন্য মৃত্যুর পরে মৃতদেহ রক্ষা করিবার জন্য সর্বপ্রকার যত্ন ও চেষ্টা করা হইত। মৃতদেহের ভিতরের যন্ত্রগুলি সব বাহির করা হইত। নুনের জল এবং এক ধরনের মসলা দিয়া দেহ সিক্ত করা হইত এবং উহা শবাধারে স্থাপন করিবার পূর্বে সযত্নে কাপড় দিয়া ঢাকা হইত। এইভাবে রক্ষিত দেহকে বলে 'মমী'। এই মমী কবরের একটি কক্ষে সমাহিত করা হইত; তাহার পাশের কক্ষে খাদ্য, পানীয় ও অন্যান্য ব্যবহারের জিনিস রাখা হইত। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা তুতামন্ খামেনের কবর খুঁড়িয়া বাহির করা হইয়াছে। এই কবরের মধ্যে খাট, চেয়ার, টুল, সুন্দর সুন্দর পাত্র, জমকালো পোশাক, ইত্যাদি বহু দ্রব্য বাহির হইয়াছে।



মিশরীয় মমী

উপজীবিকা ঃ মিশরীয়দের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষিকর্ম। মিশরের সমাধিক্ষেত্রের দেওয়ালগুলিতে বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত লোকের ছবি দেখিতে পাওয়া যায়, একটিতে একজন স্বর্ণকার কিভাবে গহনা প্রস্তুত করিতেছে—তাহা অঙ্কিত রহিয়াছে, অপরটিতে একজন কুমার কিভাবে চাকা ঘুরাইয়া পাত্র নির্মাণ করিতেছে ও ঢাকা-দেওয়া চুল্লীতে উহা পোড়াইতেছে তাহা দেখান হইয়াছে। অন্যান্যগুলিতে মণিকার, কাঠমিস্ত্রী ও তন্তুশিল্পীর ছবি আছে।

অনুশীলনী

১। মিশরকে কেন নীল নদের দান বলা হয় ?
২। মিশরের রাজা ও পুরোহিত শ্রেণীর ক্ষমতা সম্পর্কে যাহা জান লিখ।
৩। মিশরের লেখক সম্প্রদায়ের গুরুত্ব আলোচনা কর।
৪। পিরামিড সম্পর্কে যাহা জান লিখ।
৫। মিশরের লোকদের ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন :

১। মিশরের রাজাকে কি নাম দেওয়া হইত ? তিনি কি কি কাজ করিতেন ?
২। মিশরীয় লিপিকে ধর্মীয় লিপি বলা হয় কেন ?
৩। কিভাবে পপাইরাস তৈয়ারী করা হইত ?
৪। মিশরের লেখকশ্রেণী কি কি কাজ করিত ?
৫। মিশরের সৈন্যবাহিনী কেমন ছিল ?
৬। মমী বলিতে কি বুঝ ? কিভাবে মমী তৈয়ারী হইত ?
৭। মিশরীয় লোকদের উপজীবিকা সম্পর্কে কি জান ?

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। মিশরের রাজাকে — বলে।
২। মিশরীয় লিপি — বা — বলিয়া পরিচিত।
৩। মিশরীয় সভ্যতার প্রধান উল্লেখযোগ্য জিনিস হইল উহাদের —।
৪। মিশরীয়দের প্রধান উপজীবিকা ছিল —।

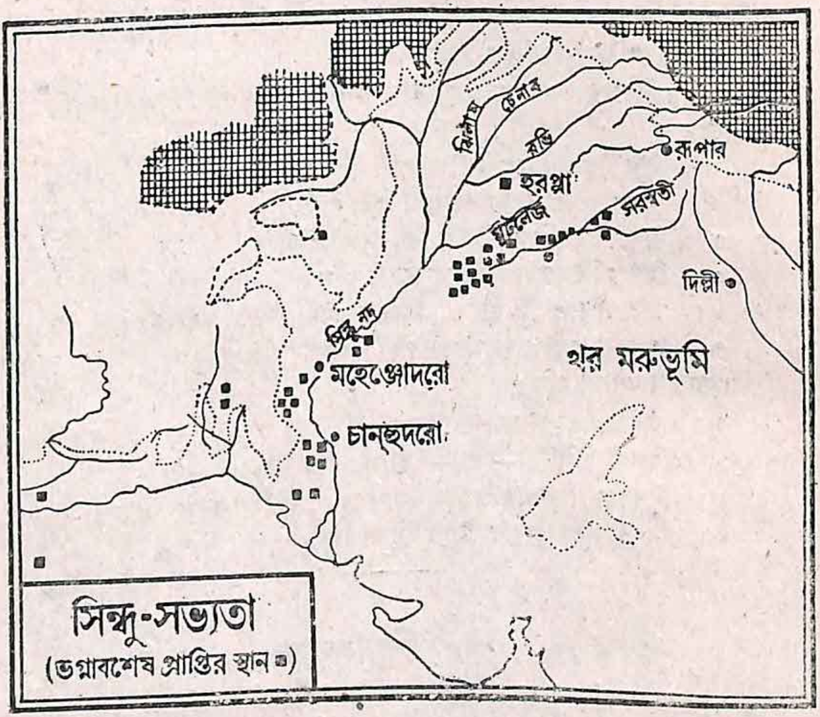
(গ) সিন্ধু-সভ্যতা

সূচনা : ভারতে বসবাসকারী আদিম মানুষের ঘরবাড়ি ও তাহাদের দেহাবশেষ প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তবে সম্প্রতি মহীশূরের নিকটস্থ চিতলদ্রুগে প্রস্তরযুগের কিছু জিনিসপত্র ও জ্যামিতিক রেখাঙ্কিত মৃৎপাত্রের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ঐ সকল জিনিসপত্র প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০০ অব্দে ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করেন। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইল সিন্ধু-সভ্যতার আবিষ্কার।

পূর্বে ঐতিহাসিকদের বিশ্বাস ছিল যে, আর্য সভ্যতাই ভারতের প্রথম সভ্যতা, কিন্তু বর্তমানে সিন্ধু দেশে নূতন আবিষ্কারের ফলে এই ধারণা বদলাইয়া গিয়াছে। এই কথা প্রমাণিত হইয়াছে যে, আর্যদের

ভারতে আগমনের বহুশত বৎসর পূর্বে সিন্ধু-সভ্যতা চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল এবং সিন্ধু-সভ্যতাই ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত হরপ্পা নামক স্থানে কয়েকটি প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়। পরে ১৯২১



খ্রীষ্টাব্দে দয়ারাম সাহানী ঐ স্থানে পুনরায় খননকার্য চালান। পর বৎসর বাঙালী প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিন্ধুপ্রদেশের লার্কানা জেলায় অবস্থিত মহেঞ্জো-দড়োতে কাজ আরম্ভ করেন। উভয় স্থানে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলির মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য বর্তমান থাকায় প্রমাণিত হয় যে, উভয় স্থানের ধ্বংসাবশেষ একই সভ্যতার নিদর্শন। পরবর্তী কালে চানহুদারো, অমৃরী, রূপার প্রভৃতি নানাস্থানে ঐ একই প্রকার সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মহেঞ্জো-দড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার

তবে মূলত সিন্ধুর অববাহিকা অঞ্চলে এই সভ্যতা অধিক বিস্তৃত ছিল বলিয়া ইহা সিন্ধু-সভ্যতা নামে পরিচিত।

হরপ্পা ও মহেঞ্জো-দড়ো হইতে যে-সব সীলমোহর পাওয়া গিয়াছে তাহার উপরের লেখাগুলি এখনও পর্যন্ত কেহ পড়িতে পারে নাই। সুতরাং উহা হইতে সে-যুগের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই জানিবার উপায় নাই। কিন্তু মহেঞ্জো-দড়োতে যে-প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ বাহির হইয়াছে তাহা হইতে আমরা সেকালের লোকেদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা করিতে পারি।

নাগরিক জীবন

সিন্ধু-সভ্যতা ছিল নগর-কেন্দ্রিক। মহেঞ্জো-দড়ো নগরটি ছিল সুপরিকল্পিত ও আয়তনে সুবিশাল। উন্নত ধরনের নাগরিক জীবন-যাত্রার অনেক নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। নগরের রাস্তাগুলি সোজা ও চওড়া ছিল এবং ইহাদের দুই পাশে পোড়ান ইটের বাড়ি ছিল। বাড়িগুলি কোথাও দুই কামরাযুক্ত এবং কোথাও বহু কামরাবিশিষ্ট ছিল। দ্বিতল ও ত্রিতল বাড়ির নিদর্শনও আবিষ্কৃত হইয়াছে। জনস্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর ছিল। বাড়ির উপরতলা হইতে প্রাচীরের মধ্যে গাঁথা অথবা ইট দিয়া ঢাকা পোড়ান মাটির নল বাহিয়া জল নীচে আসিত। প্রত্যেক বাড়ি হইতে জল বাহির হইয়া গিয়া রাস্তার বড় নর্দমায় পড়িত। বাড়ির জঞ্জাল ও ময়লা ফেলিবার জন্য রাস্তায় বড় বড় পাত্র থাকিত। বাড়িতে খোলা উঠান, কূপ ও স্নানাগার ছিল। কয়েকটি বড় বাড়ি বাহির হইয়াছে। স্তম্ভবিশিষ্ট হলঘর দেখিতে পাওয়া যায়। সভাগৃহ, প্রার্থনা মন্দির বা শস্যভাণ্ডার বলিয়া ইহাকে অনুমান করা হয়। মহেঞ্জো-দড়োতে আবিষ্কৃত একটি সাধারণ স্নানাগার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার নীচে নামিবার সিঁড়ি এবং জল প্রবেশের ও বহির্গমনের ব্যবস্থা ছিল। চারি-দিকে ছোট-বড় ঘর ছিল, সম্ভবত স্নানের পরে বস্ত্র পরিবর্তনের জন্য।

শহরের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু কিছু অনুমান করা যাইতে পারে। উহারা গম ও যব চাষ করিত, বার্লি

ও খেজুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইত। তাহারা জীবজন্তুর মাংস এবং নদী হইতে প্রচুর মাছ ধরিয়া খাইত। গরু, ভেড়া,

খাদ্য ও জীবজন্তু

শূকর প্রভৃতি পশু পালন করিত। তাহা ছাড়া



সীলমোহর

মহিষ, উট, হাতী ও হরিণের মৃতদেহের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। কুঁজবিশিষ্ট ষাঁড়, বাঘ, বানর, কুকুর এবং খরগোশও তাহাদের নিকট অপরিচিত ছিল না, কারণ এখানে প্রাপ্ত সীলমোহরে ঐ সকল জন্তুর চিহ্ন আঁকা রহিয়াছে। কিন্তু বিড়াল ও ঘোড়ার সহিত তাহারা বিশেষ পরিচিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। চেয়ার, কাছিমের খোলার চামচ ও রূপার বাসনপত্র পাওয়া গিয়াছে। রন্ধনের জন্য মৃৎ-

দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য জিনিসপত্র

পাত্র ও ধাতুপাত্র ব্যবহৃত হইত বলিয়া অনুমান করা হয়। সোনা, রূপা এবং নানাবিধ মূল্যবান মাণিক্য অলংকাররূপে ব্যবহৃত হইত। মহিষের শিং ও হাতীর দাঁতের চিরুনি দেখিতে পাওয়া যায়। সূচ, কাঁচি, পাশার ঘুঁটি প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সামগ্রী প্রচলিত ছিল। শিশুদের নানারকম খেলনাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখানে মৃৎশিল্পের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল।

শিল্প

নিকটস্থ নদীতীরে সহজেই ভাল মাটি পাওয়া যাইত। এই মাটি কুমারের চাকায় দ্রুত ঘুরাইয়া নানারকম পাত্র গড়া হইত এবং পাত্রগুলিকে গোল উনানে পোড়ান হইত। তারপর উহা পালিশ করা হইত। ইটের ভাটায় ইট পোড়ান হইত।



মৃৎপাত্র

পশম ও তূলা হইতে সুতা কাটা ও কাপড় বোনার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ঊর্ধ্বাঙ্গ ও নিম্নাঙ্গের জন্য পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্রের ব্যবহার ছিল। স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে কণ্ঠহার, বালা, বাজু, অঙ্গুরীয় ও কুণ্ডল ব্যবহার করিত। পুরুষেরা দাড়ি রাখিত, কিন্তু গোঁফ কামাইয়া ফেলিত।

পোশাক পরিচ্ছদ

অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে কাঁসার তৈয়ারী কুঠার, ছুরি, করাত, কাস্তে, ক্ষুর, মাছ ধরিবার বঁড়শি, বর্শা, তীর-ধনুক প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে।

অস্ত্রশস্ত্র

সমুদ্র ও স্থলপথে বহির্বিশ্বের সহিত বাণিজ্য চলিত বলিয়া মনে হয়। মিশর ও সুমেরীয় অঞ্চলের সহিত ব্যবসায়িক লেনদেন ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। বাণিজ্যের নিমিত্ত সুনির্দিষ্ট ওজন প্রণালী ব্যবহৃত হইত এবং সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত চিত্রলিপিতে নৌকার প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়।

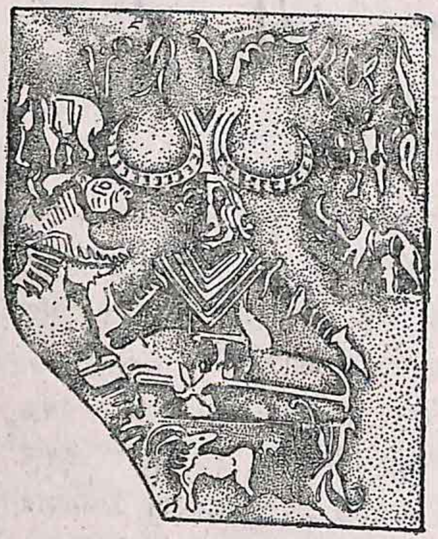
ব্যবসায়-বাণিজ্য

ধর্ম ঃ মহেঞ্জো-দড়োতে কোন মন্দিরের চিহ্ন নাই, কিন্তু অনেক দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। এই যুগের প্রধান উপাস্য দেবী ছিলেন জগন্মাতা বা প্রকৃতি দেবী—অনেকটা এখানকার গ্রাম্য দেবতার মত; শিবমূর্তি ও শিবলিঙ্গের মত পাথরও পাওয়া গিয়াছে। তিনটি মাথাযুক্ত ও পশুপরিবৃত একটি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। উহা পশুপতি শিব বলিয়া মনে হয়। তাহা ছাড়া গাছ ও জীবজন্তুর পূজা প্রচলিত ছিল। মৃতদেহ সমাধিস্থ বা দাহ করা—উভয় প্রথাই প্রচলিত ছিল।

জগন্মাতা ও পশুপতি শিবমূর্তি

সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস ঃ সিন্ধু উপত্যকায় যে-সকল গৃহের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সাহায্যেই সেই সময়ে কিরূপ সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস ছিল তাহা অনুমান করা যায়। সিন্ধু উপত্যকায় অনেক প্রশস্ত গৃহের সন্ধান পাওয়া যায়। সম্ভবত সেগুলি ধনীদের জন্য নির্মিত হইয়াছিল। এ-ছাড়া হরপ্পায় বহু

সংখ্যক বাসিন্দার জন্য এক ধরনের ঘরবাড়ির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই বাড়িগুলির সহিত প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার ক্রীতদাসদের জন্য নির্মিত গৃহের সাদৃশ্য আছে। সম্ভবত হরপ্পার ঐ সকল ঘরবাড়িতে স্থানীয় শ্রমিকেরা বসবাস করিত। সেই সময়ের ব্যবসায়-বাণিজ্যের



দেবতা



দেবী

প্রসার এবং মৃৎশিল্পী ও ধাতুশিল্পীদের অসংখ্য শিল্পকর্ম দেখিয়া উহা অনুমান করা চলে যে, তখনকার সমাজ প্রধানত ব্যবসায়ী ও কারিগর বা শ্রমিক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।

সুমেরীয় সভ্যতার সহিত সম্পর্ক

অক্ষরের পরিবর্তে ছবির সাহায্যে লিখিবার পদ্ধতি এবং নানাবিধ কারুশিল্পের উন্নতি ও বিকাশ দেখিয়া অনেকে মনে করেন যে, সিন্ধু-সভ্যতা মেসোপটেমিয়ার সুমের প্রদেশের প্রাচীন সভ্যতার অনুরূপ। বস্তুত সুমেরীয় অঞ্চলের সহিত সিন্ধু-সভ্যতার অধিবাসীদের যে যোগাযোগ ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই, তবে উভয় সভ্যতাই এক কিনা সে-বিষয়ে মতভেদ আছে।

অনুশীলনী

১। সিন্ধু-সভ্যতার শহর পরিকল্পনা ও ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। সিন্ধু-সভ্যতার শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। সিন্ধু-সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ কিভাবে আবিষ্কৃত হয়?

২। সিন্ধু-সভ্যতার সময় সেখানকার লোকেরা কোন্ কোন্ জীবজন্তু পুষিত?

৩। সিন্ধু-সভ্যতার সময় প্রধান উপাস্য কোন্ দেবতা বা কোন্ দেবী ছিলেন?

৪। সিন্ধু-সভ্যতার যুগে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস কিরূপ ছিল?

৫। সিন্ধু-সভ্যতার সহিত সুমেরীয় সভ্যতার কি কোন যোগাযোগ ছিল?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১। — সভ্যতাই ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা।

২। সিন্ধু-সভ্যতা ছিল — কেন্দ্রিক।

৩। সিন্ধু উপত্যকার লোকদের প্রধান উপাস্য দেবী ছিলেন —।

(ঘ) চীনের প্রাচীন সভ্যতা

সূচনা ঃ পূর্ব-এশিয়ার গোবি মরুভূমির পূর্বদিকে বিশাল চীনদেশ। ভারতের মত অতি-প্রাচীনকালে চীন-সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল। ভারতে যেমন সিন্ধু উপত্যকাকে কেন্দ্র করিয়া সভ্যতার সূচনা হইয়াছিল তেমনি চীনের হোয়াং-হো নদী উপত্যকাটি প্রাচীন চীন-সভ্যতার জন্মস্থান হিসাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ-ছাড়া সমধিক গুরুত্বপূর্ণ সমতলক্ষেত্রটি ইহারই দক্ষিণে ইয়াং-সি-কিয়াং নদী উপত্যকায় অবস্থিত। এই উপত্যকাদ্বয়ের উর্বর মৃত্তিকা এবং নদীজলের প্রাচুর্যতা-হেতু এখানে চাষবাস সহজ ছিল। তাই অতি-প্রাচীনকালেই হোয়াং-হো ও ইয়াং-সি-কিয়াং উপত্যকাকে কেন্দ্র করিয়া নাগরিক সভ্যতার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল।

চীনের প্রাচীন ইতিহাস ঃ চীনারা কোথা হইতে আসিয়াছিল, কোন্ জাতিভুক্ত ছিল এবং তাহাদের সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে

বিশেষ কিছু জানা যায় না। চীনের বিভিন্ন স্থানে পাথরের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়াছে এবং বর্তমানে হোনান ও মাঞ্চুরীয়ায় যে-সকল প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা দ্বারা সে-যুগের জীবনযাত্রা সম্পর্কে কিছু জানা যায়। তাহারা গ্রামে বাস করিত এবং শূকর পুষিত। পাথরের কুঠার, ত্রিকোণ ছুরি ও তীরের ফলা গড়িত এবং হাড়ের ও ঝিনুকের খোলা দিয়া অন্যান্য জিনিস তৈয়ারী করিত। উহারা তাঁত বুনিত এবং মাটির পাত্র নির্মাণ করিত। এ-ছাড়া প্রস্তরযুগের উষাকালেই চীনে পিকিং ম্যানের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং উহারা আগুনের ব্যবহার জানিত। প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার সহিত প্রাচীন চীনের যোগাযোগ ছিল বলিয়া মনে করা হয়, কারণ উভয় স্থানে একই ধরনের কারুকার্য-খচিত মৃৎপাত্রের সন্ধান মিলিয়াছে। সম্ভবত উহাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল।

চীনের কিংবদন্তী ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ : চীনাদের পৌরাণিক কাহিনী ও কিংবদন্তীতে পাঁচজন প্রাচীন রাজার বর্ণনা আছে। এই পাঁচজন রাজা কঠোর পরিশ্রম করিয়া চীনাদের সুসভ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই রাজাদের আবির্ভাবের পূর্বে মানুষ পশুর মত থাকিত। তাহারা পশুর চামড়া পরিত, আর কাঁচা মাংস খাইত। প্রথম রাজা ফু-শী জনগণকে বিবাহ প্রথা, সংগীত, লিপি ও চিত্রাঙ্কন এবং জাল দিয়া মাছ ধরা প্রভৃতি শিখাইয়াছিলেন। কি করিয়া পশুদের পোষ মানাইয়া গৃহে পালন করিতে হয় এবং কিভাবে গুটিপোকাকে খাওয়াইয়া রেশম উৎপাদন করিতে হয় সে-সকল বিদ্যাও তিনি শিখাইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি শেন নুংকে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন। এই দ্বিতীয় রাজা চীনে কৃষিকার্যের প্রবর্তন করেন। তিনি কাঠের লাঙ্গল আবিষ্কার করেন। হাট-বাজার ও ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং গাছপালা হইতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার প্রণালী আবিষ্কার করেন।

তৃতীয় রাজা হোয়াং-তি চুম্বক ও গাড়ির চাকা প্রবর্তন করিয়া-

ছিলেন। তিনি চীনদেশে প্রথম ইটের ঘর নির্মাণ করেন এবং গ্রহ-নক্ষত্র সম্বন্ধে চর্চা করিবার জন্য পর্যবেক্ষণগৃহ তৈয়ারী করিয়াছিলেন। এ-ছাড়া তিনি ক্যালেণ্ডারের সংশোধন করেন এবং জমিজমার পুনর্বণ্টন করিয়াছিলেন। তিনি বর্বর জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ের খ্যাতিও অর্জন করিয়াছিলেন।

পৌরাণিক পাঁচজন রাজার মধ্যে সর্বশেষ রাজা শ্যামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি কতিপয় বর্বর জাতিকে দমন করেন এবং সাম্রাজ্যকে বারোটি প্রদেশে বিভক্ত করেন। অন্যান্য জনহিতকর কার্যের মধ্যে তাঁহার আমলের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অতি গুরুত্বপূর্ণ। কিংবদন্তী অনুযায়ী বৃদ্ধ বয়সে রাজা শ্যান এক বিখ্যাত নির্মাতাকে সিংহাসনের অংশীদার করিয়া লইয়াছিলেন। এই নির্মাতা 'ইউ' নামে পরিচিত। তাঁহারই সাহায্যে নয়টি পাহাড় কাটিয়া এবং নয়টি হ্রদের সৃষ্টি করিয়া চীনের নয়টি নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই বন্যা নিয়ন্ত্রণের ফলে চীন বিপদ-মুক্ত হইয়াছিল।

অনুশীলনী

১। চীনের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

২। চীনের কিংবদন্তী ও বন্যা-নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। কোন্ কোন্ নদী উপত্যকায় চীনদেশে সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছিল?

২। চীনের প্রাচীন কাহিনী ও কিংবদন্তীতে কয়জন রাজার কথা উল্লেখ আছে?

৩। কাহার সাহায্যে চীনের বন্যা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল? এইজন্য চীনারা তাঁহার সম্পর্কে কি বলিত?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১। চীনের পৌরাণিক কাহিনী ও কিংবদন্তীতে — জন রাজার বর্ণনা আছে।

২। সর্বশেষ রাজা — নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নদী উপত্যকাবেষ্টিত সভ্যতাসমূহের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

সূচনা ঃ নদী উপত্যকাকে কেন্দ্র করিয়াই মেসোপটেমিয়া, মিশর ও ভারতে প্রাচীন সভ্যতার জন্ম হইয়াছিল। একই সময়ে উদ্ভূত হইলেও এই সভ্য জনপদগুলি আপন আপন বৈশিষ্ট্য লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাই বিশদভাবে আলোচনা করিলে ইহাদের আকারে ও গঠন-প্রণালীতে অনেক পারস্পরিক তারতম্য দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য সর্বত্রই বিরাজমান। প্রথমতঃ, এই সকল উপত্যকার অধিবাসিগণ সকলেই ধাতুর তৈয়ারী দ্রব্যসামগ্রীর উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিল। সেইহেতু এই যুগকে এক কথায় ব্রোঞ্জ যুগ বলা চলে, তবে আরও ভালভাবে বুঝিতে হইলে এই সকল উপত্যকার সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য সে-যুগের সামাজিক জীবন। এইসব নদী উপত্যকাবেষ্টিত জনপদগুলির অধিবাসিগণ যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে সুপরিকল্পিত জীবন যাপন করিত। তাহাদের আর প্রকৃতির খেয়ালখুশির উপর ততটা নির্ভর করিতে হইত না। তাহারা জলাভূমি ও মরুভূমির অনেক পতিত জলাশয় ও জমিজমা উদ্ধার করিয়া মৎস্য চাষ ও শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়াছিল। খাল খনন করিয়া অনেক জলপথ তৈয়ারী করিয়াছিল। সেগুলির মাধ্যমে একস্থান হইতে অপরাপর স্থানে খাদ্যশস্য চলাচল করিত এবং সেই সকল খাদ্য সংরক্ষণের জন্য মজুত ভাণ্ডার গড়া হইয়াছিল, ফলে খরা বা অনাবৃষ্টির ফলে হঠাৎ কোথাও খাদ্যাভাব দেখা দিলে মজুত ভাণ্ডার হইতে জলপথে সমগ্র উপত্যকা অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্য বিলিবণ্টন করা সম্ভবপর ছিল। যাহারা স্থায়ী বাসিন্দা তাহাদের লইয়াই রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালিত হইত। ভিন্ন

সামাজিক জীবন

ভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ বন্ধ হইয়াছিল। অন্যান্য ধরনের অভ্যন্তরীণ কলহও প্রশমিত হইয়াছিল এবং সেইহেতু যুদ্ধবিগ্রহও কমিয়া গিয়াছিল।

উপত্যকা অঞ্চলের জীবনযাত্রার মানও অনেক উন্নত ছিল। শাসক-শ্রেণী ও মধ্যবিত্তশ্রেণী যেভাবে জীবন যাপন করিত এবং যে-ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করিত তাহা সেই সময়ে এই সভ্য অঞ্চলের বাহিরের কেহ কল্পনাও করিতে পারিত না। এমন কি, সাধারণ মানুষের জন্যও স্বাস্থ্যকর ঘরবাড়ি ছিল। হরপ্পায় আবিষ্কৃত শ্রমিকদের জন্য নির্মিত বাসগৃহই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

নদী উপত্যকাবেষ্টিত সভ্য জনপদগুলির অর্থনৈতিক জীবনেও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ধাতুনির্মিত যন্ত্রপাতির

অর্থনৈতিক জীবন

আবিষ্কার এবং সেগুলির ব্যবহার মানুষের জীবনধারা উন্নত করিয়াছিল। ফলে তখনকার মানুষ অনেক কম পরিশ্রম করিয়া অনেক বেশী আয় করিতে পারিত। ধাতুর পর্যাপ্ত সরবরাহ ছিল বলিয়া দক্ষ শ্রমিকদের জীবিকা অর্জনের পথে আর কোন বাধা ছিল না। ধাতুনির্মিত জিনিসপত্রের কদর বৃদ্ধি পাইতেছিল।

এদিকে ধাতুনির্মিত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলেও নদী উপত্যকা অঞ্চলে ধাতু খুবই দুষ্প্রাপ্য ছিল। ফলে ব্রোঞ্জ নির্মিত অস্ত্রশস্ত্রের

ধাতুশিল্পীদের জীবিকা ও খাদ্য সংস্থান

দাম এত বেশী ছিল যে, অনেকেই তাহা ক্রয় করিতে পারিত না। তাই পাথরের অস্ত্রশস্ত্র তখনও প্রচলিত ছিল। এ-ছাড়া নদী উপত্যকা অঞ্চলে তামার আকর বা টিন পাওয়া যাইত না। সেইজন্য উহা আমদানী করিতে হইত এবং এইসব ধাতু খনি হইতে উত্তোলন করিতে, ব্যবহারের উপযোগী করিতে বা সেইসব বিলি-বণ্টন করিবার জন্য অনেক কর্মী সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকিত। তাহারা এই কাজে এতই ব্যস্ত ছিল যে, নিজেদের জন্য খাদ্যোৎপাদন করিতে পারিত না। সেইজন্য

অতিরিক্ত উৎপাদন করিয়া তখনকার সমাজ ঐসব ধাতুশিল্পীদের খাদ্যের যোগান দিত।

যদিও তখনকার দিনের কৃষক সম্প্রদায়ই এই অতিরিক্ত খাদ্যোৎপাদন করিত কিন্তু তাহারা তাহা নিজ প্রয়োজনে লাগাইতে পারিত না। রাজা, পুরোহিত ও অভিজাত শ্রেণী এই অতিরিক্ত খাদ্য সংগ্রহ করিয়া মজুত করিয়া রাখিত। মিশরদেশে কৃষিকার্য এবং খনিতে নিয়োজিত শ্রমিকদের মধ্যে কেহই ধাতুনির্মিত অস্ত্রের ব্যবহার করিতে সমর্থ ছিল না। সাধারণত তখনকার দিনের রাজকীয় সৈন্যবাহিনী ও নৌ-বাহিনীতে ধাতুনির্মিত অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হইত এবং রাষ্ট্র ও মন্দিরের সংশ্লিষ্ট কারিগরগণই ধাতুর কাজ করিতে পাইত।

তখনকার ধাতুর তৈয়ারী অস্ত্রশস্ত্রের উপযোগিতা ও শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। যে-সকল ব্যক্তি এগুলি সংগ্রহ করিতে ও ব্যবহার করিতে সমর্থ ছিল তাহারাই ক্রমশ সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছিল। এই প্রসঙ্গে মিশরের ফারাও বা সুমেরীয় সভ্যতার নগরপালদের কথা উল্লেখ করা চলে।

অনুশীলনী

১। নদী উপত্যকা অঞ্চলের লোকদের সামাজিক জীবন সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

২। নদী উপত্যকার অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। নদী উপত্যকায় কোন অঞ্চলে হঠাৎ খাদ্যাভাব দেখা দিলে কিভাবে তাহা নিয়ন্ত্রিত হইত?

২। নদী উপত্যকায় কাহাদের লইয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালিত হইত?

৩। ধাতু আবিষ্কৃত হইবার ফলে অর্থনৈতিক জীবনধারার কি উন্নতি হইয়াছিল?

৪। ধাতুশিল্পীদের জীবিকা অর্জন ও খাদ্য সংস্থানের কি কি ব্যবস্থা ছিল?

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। নদী উপত্যকার লোকেরা — মাধ্যমে সুপরিকল্পিত জীবন যাপন করিত।

২। ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে — বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

৩। সাধারণ মানুষের জন্যও স্বাস্থ্যকর — ছিল।

সপ্তম অধ্যায়

লৌহযুগ

লৌহের আবিষ্কার, ব্যবহার ও গুরুত্ব : পৃথিবীর কোথায় সর্বপ্রথম লৌহের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল এবং কে বা কাহারা উহা প্রথম ব্যবহার করিয়াছিল তাহা আজও অজ্ঞাত। প্রাচীন মিশরীয় রাজবংশের উত্থানের পূর্বেই ঐ দেশের লোকেরা এক ধরনের লৌহের সন্ধান পাইয়াছিল। সেগুলি সেখানকার সমাধিক্ষেত্রগুলির স্বর্ণের সহিত গুটিকাযুক্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল। তবে শিল্পের ক্ষেত্রে লৌহের প্রথম প্রচলন হইয়াছিল টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস উপত্যকা অঞ্চলে। এখানে নিনেভ নগরীর পূর্বে অবস্থিত পার্বত্য অঞ্চলের খনিগুলি হইতে খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দেই প্রচুর লৌহ-আকর উত্তোলন করা হইয়াছিল। এ-ছাড়া কৃষ্ণসাগরের কাছাকাছি এশিয়া মাইনরের পাহাড়-পর্বতেও অনেকগুলি খনি ছিল। সেখান হইতে হিত্তাইতরা প্রচুর লৌহ-আকর উত্তোলন করিত। ক্রমে তাহারাই লৌহের একচেটিয়া কারবারী হইয়া উঠিয়াছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ১২০০ অব্দে তাহাদের এই একচেটিয়া অধিকারের অবসান ঘটিয়াছিল। অতঃপর নিকট প্রাচ্য ও ইউরোপের লোকেরা যখন লৌহের গুণাগুণ বুঝিয়া

উহা কাজে লাগাইতে লাগিল, বস্তুত তখন হইতেই প্রকৃতপক্ষে লৌহযুগের সূচনা হইয়াছিল।

ব্রোঞ্জ অপেক্ষা সস্তা বলিয়া খুব সহজেই লৌহের কদর বাড়িয়া গিয়াছিল। ক্রমে যুদ্ধরথ ও সামরিক অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের ক্ষেত্রেও লৌহের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইল।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনঃ লৌহযুগের পূর্ববর্তী ব্রোঞ্জ যুগের সমাজে অভিজাত শ্রেণীর প্রাধান্য ছিল। তাহাদের অসংখ্য পশুপাল ও ক্রীতদাস ছিল। কিন্তু লৌহযুগের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কৃষক শ্রেণীর উন্নতি দেখা দিয়াছিল এবং ক্রমে এই কৃষক সম্প্রদায়ই সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিল। কারণ লৌহ নির্মিত অনেক যন্ত্রপাতি তৈয়ারী হওয়ায় কৃষিকর্মে অনেক বৈচিত্র্য দেখা দিল। এখন হইতে পূর্বাপেক্ষা আরও ব্যাপক অঞ্চল জুড়িয়া নিবিড়ভাবে চাষ-আবাদ শুরু হইল।

লৌহযুগের মানুষেরা বড় বড় গ্রামে বাস করিত, কারণ কৃষিকর্মই ছিল তাহাদের প্রধান উপজীবিকা। আগের যুগের ছোট ছোট গ্রাম অপেক্ষা এখনকার গ্রামগুলি অনেক সুরক্ষিত ছিল। অনেক সময় কতকগুলি গ্রাম একসঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া গ্রাম্য জীবনধারায় বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছিল।

লৌহ ব্যবহারের ফলে এশিয়া মহাদেশের কোথাও কোনরূপ স্থায়ী ও ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তন ঘটে নাই। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দে যেমন ছিল তেমনি রহিল। এদিকে এই সময় পশ্চিম-এশিয়ায় বর্ণমালা ও মুদ্রাব্যবস্থার প্রচলন হইয়াছিল। ইতিপূর্বে লিখিবার ব্যাপারে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর একচেটিয়া অধিকার ছিল। সকলে লিখিবার কাজ জানিত না। বর্ণমালা আবিষ্কৃত হইলে সমাজের সকল স্তরে লিখিবার বিদ্যা ছড়াইয়া পড়িল। বর্ণমালার ন্যায় মুদ্রাব্যবস্থা প্রচলনের ফলে অনেক সুবিধা হইয়াছিল। কৃষকেরা তাহাদের উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য সঞ্চয় না করিয়া তাহার পরিবর্তে মুদ্রা সংগ্রহ

করিতে পারিত। ইহা দ্বারা সে দরকার মত জিনিসপত্র ক্রয় করিতে পারিত। শ্রমজীবীরাও ইতিপূর্বে শ্রমের পরিবর্তে খাদ্যশস্য পাইত এবং তাহার সবই খাইয়া ফেলিত। কিন্তু মুদ্রাব্যবস্থা প্রচলন হইলে সে যে-মুদ্রা অর্জন করিত তাহা হইতে কিছু অন্তত সঞ্চয় করিতে পারিত। খুচরা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও মুদ্রার যথেষ্ট গুরুত্ব দেখা দিল।

রাজশক্তি ঃ লোহযুগে রাজতন্ত্র ব্রোঞ্জযুগে যেমন ছিল তেমনি রহিল। মিশর, ব্যাবিলন ও এশিরীয় দেশে ঈশ্বরদত্ত রাজক্ষমতার কোন পরিবর্তন হয় নাই। লিডিয়া, আর্মেনিয়া ও ইহুদিরাজ্যেও ইহারই অনুকরণে রাজতন্ত্র গঠিত হইয়াছিল। এদিকে মিড্ ও পারসীকগণ তাহাদের বিজিত সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থাই গ্রহণ করিয়াছিল।

ইউরোপের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে কিন্তু প্রাচ্যের ন্যায় ঈশ্বরদত্ত বা ধর্ম-ভিত্তিক রাজতন্ত্র তেমন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সেখানকার রাজগণের অধীন জমিদারগণ খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, লৌহঅস্ত্র সুলভ বলিয়া এইসব জমিদারেরা আপন আপন সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছিল এবং দস্যুবৃত্তিতে লিপ্ত হইয়া অনেক ধনসঞ্চয় করিয়াছিল। ফলে গ্রীসদেশে, ইতালীতে ও ফিনিসীয় উপনিবেশে রাজতন্ত্র প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিল। কোথাও কোথাও নামেমাত্র ইহা অবশিষ্ট ছিল।

অনুশীলনী

১। কিভাবে এবং কোন্ সময় লোহযুগের সূচনা হইয়াছিল ?

২। লোহযুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৩। লোহযুগে রাজশক্তির প্রসার সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। শিল্পের কাজে প্রথম কোথায় লৌহের প্রচলন হইয়াছিল ? লৌহ-যুগের আবির্ভাবের ফলে সমাজে কোন্ শ্রেণী প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিল ?

২। লৌহযুগের আবির্ভাবে এশিয়ায় কি কোন সামাজিক পরিবর্তন হইয়াছিল?

৩। লৌহযুগে বর্ণমালা ও মুদ্রা ব্যবহারের ফলে কি কি পরিবর্তন হইয়াছিল?

৪। লৌহযুগে মিশর, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশে রাজশক্তির কি কোন রূপান্তর ঘটিয়াছিল?

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। ব্রোঞ্জযুগের সমাজে — শ্রেণীর প্রাধান্য ছিল।

২। লৌহযুগের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে — শ্রেণীর উন্নতি দেখা দিয়াছিল।

৩। লৌহযুগের লোকেরা বড় বড় — বাস করিত।

অষ্টম অধ্যায়

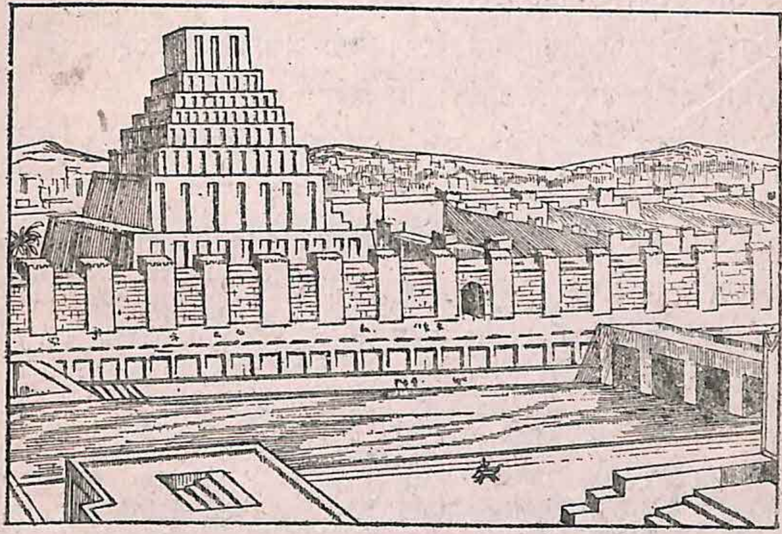
ব্যাবিলন

সূচনা : ব্যাবিলন নামের অর্থ 'ভগবানের দ্বার'। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রাচীন ব্যাবিলন রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহার উত্তরে আক্কাদ ও দক্ষিণে সুমের উপত্যকা।

কৃষিব্যবস্থা ও ব্যবসায়-বাণিজ্য : ব্যাবিলনের অধিকাংশ জমি-জমাতে সেখানকার প্রজা ও ক্রীতদাসেরা চাষবাস করিত, আর কিছু জমিতে কৃষকেরা জমির মালিকানা অর্জন করিয়াছিল। অনেককাল আগেই পাথরের নিড়ানি দিয়া মাটি খুঁড়িয়া জমিগুলি চাষের উপযোগী করা হইয়াছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০০ অব্দে ব্যবহৃত একটি লাঙলও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ-ছাড়া ব্যাবিলনের সেচব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত ছিল। নদীগুলি স্ফীত হইয়া যাহাতে দেশে বন্যার সৃষ্টি করিতে না পারে সেজন্য ব্যাবিলনের লোকেরা সতর্ক থাকিত। কৃষিক্ষেত্রগুলি রক্ষা করিবার জন্য উহারা জমির ধারে ধারে বাঁধ

তৈয়ারি করিয়াছিল এবং বন্যার জল নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে খাল খনন ও জলাধার নির্মাণ করিয়াছিল। ফলে ব্যাবিলনের কৃষিক্ষেত্রে নানা ধরনের শস্য ও ডাল উৎপন্ন হইত। সেখানে ফলের ও বাদামের বাগান ছিল, আর ছিল খেজুর।

ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাবিলনের বেশ সুনাম ছিল। প্রাচীন ব্যাবিলনে পণ্য পরিবহনের জন্য চাকা-লাগানো গাড়ি ছিল। গাড়ি



ব্যাবিলন নগরী

চালাইবার জন্য গাধা ও ঘোড়া ব্যবহৃত হইত। পরিবহন ব্যবস্থা এত উন্নত ছিল যে, ব্যাবিলনের ব্যবসায়-বাণিজ্য সহজেই প্রসার লাভ করে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই বিদেশের বাজারের সহিত উহাদের লেনদেন শুরু হইয়াছিল। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বহু দেশের বণিকেরা ব্যাবিলনের সহিত নিবিড় বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিল। ফলে ব্যাবিলনের দোকান-বাজার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে আগত পণ্যসম্ভারে পূর্ণ থাকিত। এই বাজার খুবই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। নানা শ্রেণীর লোকের আগমনে

ব্যাবিলনের বাজার

সেখানে এতই সোরগোল হইত যে, স্থানীয় বড়লোকেরা রাজধানী ব্যাবিলনে না থাকিয়া শহরতলিতে বসবাস করিত।

মন্দির ও পুরোহিত সম্প্রদায়ঃ ব্যাবিলনে অনেক মন্দির ছিল, কারণ সেখানকার রাজারা ঈশ্বরের ক্ষমাভিক্ষার উদ্দেশ্যে মন্দির নির্মাণ করাইতেন। রাজা মন্দিরের নামে বড় বড় জমি-জায়গা দান করিতেন এবং মন্দিরগুলি রাষ্ট্র হইতে অর্থ সাহায্য পাইত। যুদ্ধজয় হইলে যুদ্ধবন্দী ও লুণ্ঠিত দ্রব্যের প্রথম ভাগ মন্দিরের প্রাপ্য বলিয়া গণ্য হইত। এ-ছাড়া কোন বিশেষ ক্ষেত্রে রাজার সৌভাগ্য দেখা দিলে রাজা ঈশ্বরের নামে অতিরিক্ত দান-খয়রাত করিতেন। কিছু জমির উৎপন্ন খেজুর, শস্য কিংবা ফল বাৎসরিক কর হিসাবে মন্দিরের নামে নির্দিষ্ট ছিল। উহা না দিলে মন্দির ঐ সব জায়গা দখল করিতে পারিত। দখল হইলে স্বভাবতই সেগুলি পুরোহিতদের হাতে পড়িত। ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে সকলেই কিছু-না-কিছু মন্দিরের নামে উৎসর্গ করিত। ফলে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও রত্নাদিতে ব্যাবিলনের মন্দিরের কোষাগার পরিপূর্ণ ছিল।

মন্দিরের এই বিশাল ধনসম্পদ সেখানকার পুরোহিতেরা কিন্তু সরাসরি ভোগ করিতে পারিত না। সেগুলিকে অন্যভাবে বিনিয়োগ করিয়া পুরোহিত সম্প্রদায় দেশের সবচেয়ে বড় চাষী, উৎপাদক বা অর্থ-বিনিয়োগকারী হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিল। উহাদের হাতে দেশের অনেক বড় বড় জমির মালিকানা ছিল, বহু ক্রীতদাস ছিল এবং শত শত শ্রমজীবী উহাদের নিয়ন্ত্রণে থাকিত। মন্দিরের দোকানগুলির মাধ্যমে উহারা নানা ধরনের জিনিস বিক্রয় করিত এবং দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের বেশীর ভাগের সহিতই উহারা লিপ্ত ছিল। বিজ্ঞ বিনিয়োগকারী বলিয়া উহাদের সুনামও ছিল, উহারা কম সুদে টাকা ধার দিত এবং রুগ্ন ও গরীবদের ক্ষেত্রে সুদ লইত না। এ-ছাড়া পুরোহিতদের আইন-সংক্রান্ত কাজকর্মও করিতে হইত।

শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতি ঃ প্রাচীন ব্যাবিলনের মানুষেরা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করিত, তবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাহারা যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছিল। ভূগোল, অঙ্ক, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং চিকিৎসা-বিদ্যায় উহারা উন্নত ছিল। 'পৃথিবীর মানচিত্র' ব্যাবিলনীয়গণের ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিচয় দেয়। উহারা ব্যবসায়িক প্রয়োজনে অঙ্ক শিখিয়াছিল। উহারা গ্রহ-নক্ষত্র সম্বন্ধে চর্চা করিত এবং ক্রমে জ্যোতিষশাস্ত্রে উহাদের ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। ব্যাবিলনের জ্যোতিষীরা চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ পূর্ব হইতে গণিয়া নিতে পারিতেন। মানুষের জন্মকালে নক্ষত্রের অবস্থান দেখিয়া তাঁহারা মানুষের সমস্ত জীবনের গতি ও কোষ্ঠী গণনা করিতেন।

ব্যাবিলনে সাহিত্য-চর্চারও অভাব ছিল না। নিপ্পারের মন্দির গ্রন্থাগার ও অসুর বানীপালের গ্রন্থাগার ব্যাবিলনীয় সাহিত্যের ভাণ্ডার।

ব্যাবিলনের শিল্প ও স্থাপত্যের নিদর্শনগুলির অধিকাংশই ধ্বংস হইয়াছে। ব্যাবিলনের বিখ্যাত রাজা নেবু-কাডনেজার ব্যাবিলনকে জগতের সর্বাপেক্ষা জমকালো নগরে পরিণত করেন। দুই সারি ইটের প্রাচীর দিয়া ব্যাবিলন নগরী ঘেরা ছিল। প্রাচীরের আটটি বড় বড় তোরণ ছিল। রাজার বিশাল প্রাসাদের এককোণে ছিল সুবিখ্যাত ঝুলান বাগান। ইহা পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের একটি। সীল কাটিয়া এবং তাহার উপর চিত্র খোদাই করিয়া ব্যাবিলনীয় শিল্পিগণ অপূর্ব শিল্প সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এ-ছাড়া সেখানে হাতির দাঁতের কাজও প্রশংসনীয় ছিল।

হামুরাবির আইন ঃ প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্বে ব্যাবিলনে হামুরাবি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি বহু আইন প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে তিনিই ছিলেন কঠোর সামাজিক আইনের স্রষ্টা। তাঁহার এই আইনগুলি একটি কালো পাথরের উপর খোদাই করা হইয়াছে।

সমাজব্যবস্থা ঃ হামুরাবির আইন পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি যে, ব্যাবিলনীয় সমাজ তিনভাগে বিভক্ত ছিল—অভিজাত, মধ্যবিত্ত ও দাস সম্প্রদায়। তখন দাস সম্প্রদায়ের অবস্থা অনেকটা



রাজা হামুরাবি

উন্নত হইয়াছিল, কারণ উহারা কোন কোন ক্ষেত্রে মুক্তি অর্জন করিতে পারিত। এ-ছাড়া এই আইনে সমাজের সমস্ত নরনারীর জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

অনুশীলনী

১। ব্যাবিলনের কৃষিব্যবস্থা ও বাণিজ্যিক প্রসার সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

২। ব্যাবিলনের মন্দির ও পুরোহিতদের সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩। ব্যাবিলনের শিক্ষা-দীক্ষা এবং সাংস্কৃতিক উন্নতি সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। ব্যাবিলনের রাজার কিরূপ সমৃদ্ধি ছিল?

২। ব্যাবিলন কথার অর্থ কি? ব্যাবিলনের পুরোহিতগণ মন্দিরের ধনসম্পদ ভোগ করিতেন?

৩। ব্যাবিলনে জ্যোতিষশাস্ত্র কিরূপ উন্নত ছিল? কোন্ রাজা ব্যাবিলনকে জমকালো নগরে পরিণত করিয়াছিলেন?

৪। হামুরাবি কে ছিলেন? তিনি কিজন্য বিখ্যাত?

৫। ব্যাবিলনের সমাজব্যবস্থা কিরূপ ছিল?

শূন্যস্থান পূরণ কর:

১। ব্যাবিলন নামের অর্থ — দ্বার।

২। ব্যাবিলনের অধিকাংশ জমিতে — চাষবাস করিত।

৩। — ক্ষেত্রে ব্যাবিলনের খুব সুনাম ছিল।

৪। ব্যাবিলনীয় সমাজ — ভাগে বিভক্ত ছিল।

নবম অধ্যায়

মিশরীয় সাম্রাজ্য

সূচনা: প্রাচীনকালে মিশর উত্তর রাজ্য ও দক্ষিণ রাজ্য—এই দুই রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ক্রমে সমগ্র মিশরে একটি রাজ্য স্থাপিত হয় এবং পর পর অনেকগুলি রাজবংশ মিশরে রাজত্ব করে। দ্বাদশ রাজবংশের রাজত্বকালের শেষে মিশর আবার বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় এশিয়া হইতে এক নূতন জাতি আসিয়া মিশর জয় করে। এই জাতির নাম হিক্‌সস্। এই হিক্‌সস্ রাজারা যখন উত্তর-মিশরে রাজত্ব করিতেছিলেন সেই সময় দক্ষিণ-মিশরে থিব্‌সের এক মিশরীয় রাজকুমার স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। বহু যুদ্ধের পর মিশর হইতে হিক্‌সস্ জাতিকে তাড়াইয়া দিয়া বিজয়ী রাজকুমার একটি নূতন রাজবংশ স্থাপন করিলেন। এইভাবে মিশরে অষ্টাদশ রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইল (খ্রীষ্টপূর্ব ১৫৮০ অব্দ) এবং থিব্‌স্ নগরী রাজধানী হইল।

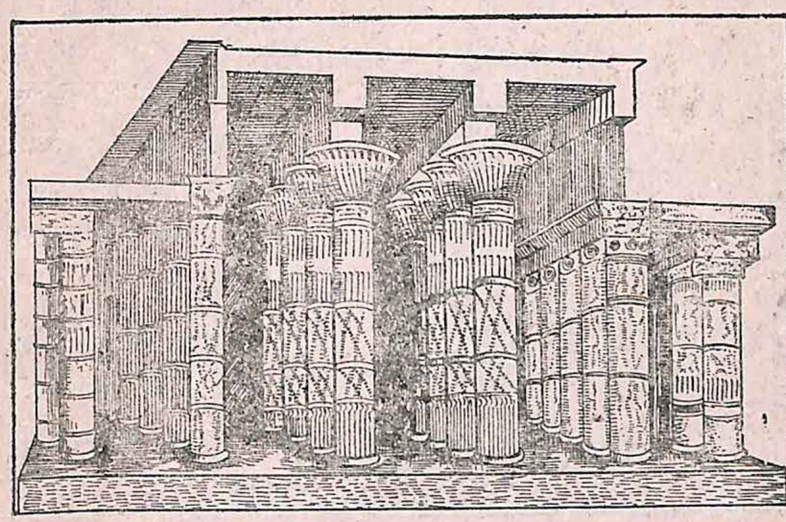
মিশরীয় উপনিবেশ : অষ্টাদশ ও উনবিংশ রাজবংশের রাজত্ব-কালকে মিশরীয় সাম্রাজ্যের যুগ বলিয়া অভিহিত করা হয়। এতদিন পর্যন্ত মিশরীয়রা যুদ্ধ করিতে ভালবাসিত না। তাহারা নিজেদের দেশের বাহিরে কখনও রাজ্য বিস্তার করে নাই। কিন্তু এখন এই নূতন বংশের রাজারা দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। তাঁহারা সিরিয়া ও ফিনিসীয়া জয় করিয়াছিল এবং ইউফ্রেটিস নদীর উপরিভাগে অবস্থিত মিটানি ও হিত্তাইতদের সহিতও যুদ্ধ করিয়াছিল। ইউফ্রেটিস নদী হইতে শুরু করিয়া লিবিয়ার মরু অঞ্চল পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগে তাঁহাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এমন কি, ইথিওপিয়ার চৌহদ্দি পর্যন্ত তাঁহাদের সাম্রাজ্য প্রসারিত হইয়াছিল এবং ভূমধ্যসাগরের অপর পারের দেশগুলি হইতেও তাঁহারা কর আদায় করিত। ক্রমে এই সাম্রাজ্যের সর্বত্র এক বিশাল মিশরীয় উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই নূতন সাম্রাজ্যের যুগে প্রথম খ্যাতনামা ও দিগ্বিজয়ী সম্রাট তৃতীয় থাটমোজের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মিশরের শেষ পরাক্রান্ত সম্রাট ছিলেন দ্বিতীয় রামসেস্।



তৃতীয় থাটমোজ

পুরোহিত শ্রেণী : মিশরীয় সভ্যতার ইতিহাসে পুরোহিত শ্রেণীর প্রাধান্য সুবিদিত। ইতিমধ্যে বৈদেশিক প্রভাবে মিশরীয়দের ধর্মীয় চিন্তাধারার পরিবর্তন হইয়াছিল। এদিকে সম্রাট তৃতীয় থাটমোজের সময় থিব্‌সের দেবতা অ্যামনের খ্যাতি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সময়ই কার্ণাকের সুবিখ্যাত মন্দিরের কয়েকটি স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী সম্রাট মিশরের বিভিন্ন দেবদেবীর অবসান ঘটাইয়া একমাত্র

অ্যাটন বা সূর্যদেবের পূজা প্রচলন করিলে পুরোহিত শ্রেণী চরম বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও মিশরে



কার্ণাকের মন্দির

একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত হইল না এবং এই সম্রাটের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই পুরোহিতদের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

সম্রাট দ্বিতীয় রামসেসের সময়ে পুরোহিতদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। প্রতিটি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে লুণ্ঠিত দ্রব্য এবং বিজিত দেশ হইতে আদায়ীকৃত করের প্রধান অংশ মন্দির ও পুরোহিতদের ভাগে পড়িত। সম্রাট তৃতীয় রামসেসের আমলে পুরোহিতদের ক্ষমতা চরমে উঠিয়াছিল। তখন ৭,৫০,০০০ একর জমি ও ১,০৭,০০০ জন ক্রীতদাস পুরোহিতদের অধিকারে ছিল। এ ছাড়া মিশর ও সিরিয়ার ১৬৯টি শহর হইতে রাজস্ব পাইত। এই সুবিশাল সম্পত্তির জন্য পুরোহিতদের কিন্তু কোন কর দিতে হইত না। তাঁহারা সম্রাটের নিকট হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য ও শস্যও পাইত। ফলে রামসেস্ সম্রাটদের আমলে পুরোহিতেরাই রাষ্ট্রের সর্বেসর্বা হইয়া উঠিয়াছিল। পরিশেষে এই বংশের শেষ সম্রাটকে

সরাইয়া দিয়া অ্যামন দেবের প্রধান পুরোহিত মিশরের সিংহাসন দখল করিয়াছিলেন। ক্রমে মিশরের সর্বত্র পুরোহিতদের শাসন বা দিব্যতন্ত্র প্রবর্তিত হইল। তাহাদের শাসনকালে শিল্প ও স্থাপত্যে কিছু উন্নতি হইয়াছিল, কিন্তু কুসংস্কার বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং অন্যান্য প্রগতির পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।



দ্বিতীয় র‍্যামসেস্

পুরোহিত সম্প্রদায় যাহা কিছু করিতেন এবং যে-সকল সিদ্ধান্ত লইতেন তাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া প্রচার করিতেন। ক্রমে তাঁহারা সবকিছু শোষণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, যাহার ফলে মিশরের পতন অনিবার্য হইয়া উঠিল। সীমান্ত অঞ্চলে গোলমাল দেখা দিল, উপনিবেশগুলি মিশর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। শেষে মিশর তাহার ব্যবসায়-বাণিজ্য, সোনাদানা, ক্ষমতা-প্রতিপত্তি সবকিছু হারাইয়া নিঃস্ব হইয়া পড়িল। এই সুযোগে লিবিয়া ও ইথিওপিয়ার রাজারা মিশরের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

অনুশীলনী

১। কি কারণে মিশরীয় সম্রাটগণ সাম্রাজ্য গঠনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন? তাঁহাদের সাম্রাজ্য কোথায় কোথায় প্রসারিত হইয়াছিল?

২। মিশরের ইতিহাসে পুরোহিতশ্রেণীর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন :

১। কোন্ বিদেশী জাতি মিশর আক্রমণ করিয়াছিল ?

২। সাম্রাজ্যের যুগে মিশরের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কে ছিলেন ? মিশরের শেষ পরাক্রান্ত সম্রাট কে ছিলেন ?

৩। সম্রাট তৃতীয় রামসেস্-এর সময় পুরোহিতদের ক্ষমতা কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল ?

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। অষ্টাদশ ও উনবিংশ রাজবংশের রাজত্বকালকে — যুগ বলিয়া অভিহিত করা হয়।

২। নূতন সাম্রাজ্যের যুগে প্রথম খ্যাতনামা ও দিগ্বিজয়ী — নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৩। মিশরীয় সভ্যতার ইতিহাসে — শ্রেণীর প্রাধান্য সুবিদিত।

দশম অধ্যায়

প্রাচীন ইরান

সূচনা : প্রাগৈতিহাসিক যুগে আর্যদের একটি শাখা কাস্পিয়ান সাগরের স্তেপ্ অঞ্চল হইতে দক্ষিণ-পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ খাইবার গিরিপথ অতিক্রম করিয়া পাঞ্জাবে আসিয়া উপস্থিত হয়, অপর দলটি বর্তমান ইরানীয় মালভূমির পূর্বদিকে বসতি স্থাপন করে। এই ঘটনার বহুকাল পর পারস্য উপসাগর সন্নিহিত উত্তর-পূর্বস্থ পার্বত্য অঞ্চলে পারস্ বা পারসীক উপজাতির আবির্ভাব ঘটে। এই পার্বত্যভূমি ইতিপূর্বে এলামাইটদের অধিকারে ছিল, কিন্তু ইতিমধ্যে এশিরীয় শক্তি এলামাইটদের ধ্বংস করিয়াছিল। ফলে পারসীকগণ খুব সহজেই এই অঞ্চল দখল করিলেও এশিরীয়দের সহিত সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিল। পরিশেষে খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে পারসীকগণ এশিরীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস করিল। তখন হইতেই পারসীকদের প্রকৃত

পারসীকদের উত্থান

উত্থান শুরু হইয়াছিল। পরবর্তী দুই শতাব্দী কাল ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া পারসীকগণ এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়াছিল।

ধর্মঃ বৈদিক যুগে হিন্দুরা যেমন বহু দেবদেবীর পূজা করিত, পারসীকগণও প্রথমে সেইরূপ অনেক দেবদেবীর পূজা করিত। পরে ক্রমশ এই ধর্মাচরণের মধ্যে কুসংস্কার, যজ্ঞে পশুবলিদান এবং নানাপ্রকার উৎপীড়ন প্রবেশ করে। কালক্রমে ঋষি জরথুস্ট্রের (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৬৫০ অব্দ) আবির্ভাবের ফলে পারস্যে এক নূতন ধর্মের সূচনা হয়। জরথুস্ট্র বলিতেন, সৎ ও অসতের মধ্যে একটি অবিরাম সংগ্রাম চলিতেছে। অহুর মজ্‌দা অর্থাৎ ঈশ্বরই হইলেন একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। তাঁহার সাহায্যকারী একদল দেবতা আছেন। আর এক অসৎ দল আছে, ইহাদের নায়ক আরিমান। সৎ ও অসতের মধ্যে যে-অবিরাম যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত অহুর মজ্‌দা ও তাঁহার দলের জয় হইবে। জরথুস্ট্রের শিক্ষার কতক অংশ ও স্তোত্রগুলি পরবর্তী কালে অবেস্তা নামক এক প্রাচীন পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়।

জরথুস্ট্রের আবির্ভাব

ইরানীয় ধর্মানুষ্ঠানে বলিদান বা মূর্তিপূজার কোন স্থান রহিল না। এই ধর্মে মানুষের নৈতিক উন্নতির প্রতি বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। অগ্নিকে সর্বাপেক্ষা পবিত্র বলিয়া গণ্য করা হইত। ফলে ইরানীয়গণ অগ্নির উপাসক বলিয়া পরিচিত। তাহারা কিন্তু সত্যই আগুনের পূজা করে না, আগুনকে তাহারা শ্রদ্ধা করে। তাহারা বিশ্বাস করে যে, অতি-পূর্বকালে যে-আগুন জ্বালানো হইয়াছিল তাহা আর কখনও নিভানো হয় নাই।

এ-ছাড়া মাটি, জল ও বাতাসকেও পবিত্রজ্ঞানে পূজা করা হয়। মৃতদেহ দাহ করিলে কিংবা কবর দিলে আগুন, মাটি, জল ও বাতাস দূষিত হইয়া পড়িবে। সেইজন্য ইরানীয়গণ মৃতদেহ দাহ করে না বা কবর দেয় না; 'নিস্তব্ধতার চূড়া' নামে অতি উচ্চ চূড়ায় মৃতদেহ রাখিয়া দেওয়া হয়।

অনুশীলনী

১। পারসীকদের উত্থান সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

২। ঋষি জরথ্ুস্ট্রের ধর্মমত সম্পর্কে আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। পারসীকগণ প্রথম কোথায় বসতি স্থাপন করিয়াছিল ? কখন হইতে তাহাদের প্রকৃত উত্থান হইয়াছিল ?

২। কি কারণে পারস্যে ঋষি জরথ্ুস্ট্রের আবির্ভাব হইয়াছিল ? ইরানীয় ধর্মানুষ্ঠানে কিসের উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় ?

৩। পারসীকগণ কিভাবে মৃতদেহ সৎকার করে ?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১। খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে পারসীকগণ — সাম্রাজ্য ধ্বংস করে।

২। আর এক অসৎ দল আছে, ইহাদের নায়ক —।

৩। জরথ্ুস্ট্রের শিক্ষার কতক অংশ ও স্তোত্রগুলি পরবর্তী কালে — নামক এক প্রাচীন পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়।

৪। ইরানীয়গণ — উপাসক বলিয়া পরিচিত।

একাদশ অধ্যায়

ইহুদীদের আবির্ভাব-কাহিনী

সূচনা ঃ ইহুদীরা পশ্চিম-এশিয়ার একটি প্রাচীন জাতি। প্রথমে উহাদের কোন নির্দিষ্ট বাসভূমি ছিল না। ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহারা প্রধানত মেষচারণ করিয়া জীবন ধারণ করিত, তবে জলহাওয়া ভাল থাকিলে কৃষিকর্মেও লিপ্ত থাকিত। এইভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে এক সময় উহারা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে কানান নামক একটি স্থানে আসিয়া হাজির হইয়াছিল। কালক্রমে ইহুদীরা মিশরে গিয়া বসবাস শুরু করিল।

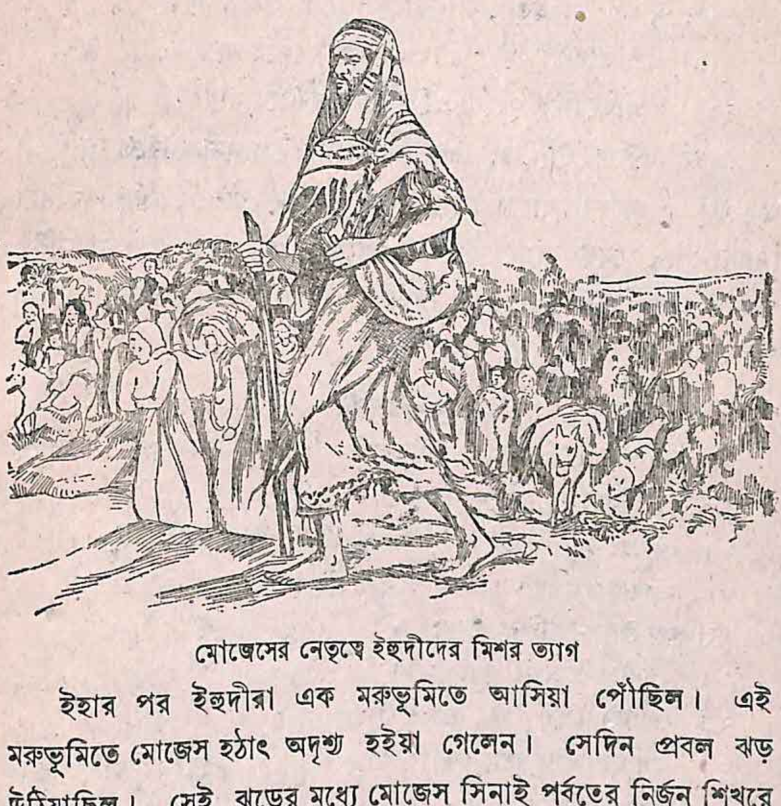
এদিকে খ্রীষ্টপূর্ব ১৭৫০ অব্দে হিক্সস্ জাতি মিশর আক্রমণ করিয়াছিল। এই আক্রমণকারীরা মিশর দখল করিলে ইহুদীরা

উহাদের কৃপা লাভ করিয়াছিল এবং খুব শীঘ্রই মিশরে ইহুদীদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু পরে যখন মিশরীয় এক রাজকুমার হিকসস্‌দের পরাস্ত ও বিতাড়িত করিল, তখন ইহুদীদের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিল। শেষে ইহুদীদের ক্রীতদাসের মত কাজ করিতে হইত এবং প্রায় তিন শত বৎসর, কি তাহারও অধিক কাল ইহুদীদের এইরূপ অবস্থার মধ্যে কাটাইতে হইয়াছিল। এদিকে ইহুদীরা মিশরে আসিবার পূর্বে উহাদের মধ্যে একদল কানানে রহিয়া গিয়াছিল। এই সময় সেখানেও দুর্ভিক্ষ, উপ-জাতীয় কোন্দল প্রভৃতি নানা বিপত্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু মিশরে ইহুদীদের অবস্থা খুবই শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, কারণ তাহাদের মুক্তির কোন উপায় ছিল না, মিশরীয় সৈন্যরা সীমান্ত অঞ্চলে এমনভাবে পাহারা দিত যাহাতে কোন ইহুদীই মিশর ছাড়িয়া পলাইতে না পারে।

মোজেস : অবশেষে খ্রীষ্টপূর্ব ১২৫০ অব্দের কোন এক সময় ইহুদী-দের মধ্যে মোজেস নামে এক বুদ্ধিমান ও সাহসী নেতার আবির্ভাব হয়। এই সময় মিশরে নানা অনর্থের সৃষ্টি হইল। নীল নদের বন্যার উপর মিশরের জীবন নির্ভর করিত। কিন্তু নীল নদে বন্যা হইল না। জল খারাপ হইয়া গেল। দেশে ব্যাঙ ও মশা-মাছির অত্যাচার আরম্ভ হইল। পশু ও মানুষের মধ্যে মড়ক দেখা দিল। মিশরের লোকে মনে করিল, মোজেস ইন্দ্রজালের প্রভাবে এই সকল অনর্থ ঘটাইতেছেন। তখন ফারাও দ্বিতীয় রামসেস্ মিশরের সম্রাট ছিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি ইহুদীদের দেশ হইতে চলিয়া যাইবার অনুমতি দিলেন। ইহুদীরা তখন মিশর ত্যাগ করিয়া কানানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। মোজেসের নেতৃত্বে গঠিত এই দলবদ্ধ প্রস্থানই ইতিহাসে 'মহান অভিনিষ্ক্রমণ' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

যাহা হউক, ইহুদীরা চলিয়া গিয়া যখন লোহিত সাগরের তীরে পৌঁছিল তখন দেখিতে পাইল যে, মিশরের সৈন্যরা তাহাদিগকে

ধরিতে আসিতেছে। ইহুদীরা নিরাপদে সমুদ্র পার হইয়া গেল, কিন্তু মিশরীয় সৈন্যরা সমুদ্রে নামিবামাত্র প্রবল বন্যা আসিয়া তাহাদিগকে ডুবাইয়া দিল।



মোজেসের নেতৃত্বে ইহুদীদের মিশর ত্যাগ

ইহার পর ইহুদীরা এক মরুভূমিতে আসিয়া পৌঁছিল। এই মরুভূমিতে মোজেস হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেলেন। সেদিন প্রবল ঝড় উঠিয়াছিল। সেই ঝড়ের মধ্যে মোজেস সিনাই পর্বতের নির্জন শিখরে ভগবানের নিকট প্রেরণা পাইয়া দুইটি পাথরের টেবিলে ইহুদীদের জন্য দশটি আদেশ লিখিয়া আনিলেন। মোজেসের এই দশটি আদেশ ইহুদীরা ভগবানের নির্দেশ বলিয়া মানিয়া থাকে। ইহুদীদের জন্য ভগবানের দশটি আদেশ এইরূপ :

(১) জিহোবা একমাত্র ঈশ্বর, এই এক ঈশ্বর ছাড়া যেন অন্য দেবতা না থাকে।

(২) কোন মূর্তি বা প্রতিমা নির্মাণ করিবে না।

(৩) বৃথা ঈশ্বরের নাম লইবে না।

(৪) বিশ্রাম দিন পবিত্র করিবে।

(৫) মাতাপিতার সমাদর করিবে।

(৬, ৭, ৮) নরহত্যা, ব্যভিচার বা চুরি করিবে না।

(৯) প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না।

(১০) প্রতিবেশীর গৃহের প্রতি লোভ করিবে না।

তখন হইতে ইহুদীরা এক ভগবানের উপাসনা করিতে লাগিল। ভগবান তাহাদের বাসের জন্য যে সুন্দর দেশ নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই প্যালেস্টাইনে মোজেস পৌঁছিতে পারেন নাই। পরবর্তী নেতা জোস্থুয়া ইহুদীদিগকে লইয়া জর্ডন নদী পার হইয়া প্যালেস্টাইনে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

অনুশীলনী

১। কিভাবে ইহুদীরা মিশরে ক্রীতদাসে পরিণত হইয়াছিল ? উহাদের কে উদ্ধার করিয়াছিলেন ?

২। মোজেসের আবির্ভাবের পর মিশরে কি কি অনর্থ ঘটিতেছিল ?

৩। ভগবানের "দশটি আদেশ" বলিতে কি বুঝ ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। ইহুদীরা প্রথমে কিভাবে জীবন কাটাইত ?

২। ইহুদীরা কখন মিশরে প্রবেশ করিয়াছিল ?

৩। মিশরের কোন্ সম্রাট ইহুদীদের মিশর ত্যাগের অনুমতি দিয়াছিলেন ?

৪। 'মহান অভিনিক্রমণ' বলিতে কি বুঝ ?

৫। ইহুদীদের ভগবানের নাম কি ? উহারা কি বহু দেবতার পূজা করিত ?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১। এইভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে এক সময় ইহুদীরা — অঞ্চলে — নামক স্থানে আসিয়া হাজির হইয়াছিল।

২। শেষে ইহুদীদের — মত কাজ করিতে হইত।

৩। মোজেসের নেতৃত্বে গঠিত এই দলবদ্ধ প্রস্থানই ইতিহাসে — বলিয়া অভিহিত।

দ্বাদশ অধ্যায়

গ্রীসের কথা

সূচনা ঃ ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অবস্থিত গ্রীস পাশ্চাত্য সভ্যতার আদি লীলাভূমি। পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রীক সভ্যতার নিকট অনেকাংশে ঋণী, তবে এখন ইহা জানা গিয়াছে যে, পাশ্চাত্য তথা গ্রীক সভ্যতার বিকাশের ক্ষেত্রে ক্রীট সভ্যতার যথেষ্ট অবদান ছিল।



ক্রীট সভ্যতার প্রভাব ঃ ঈজিয়ান সাগরে ক্রীট একটি অন্যতম প্রধান দ্বীপ। অতি প্রাচীনকালে ক্রীটকে কেন্দ্র করিয়া ঈজিয়ান অঞ্চলে সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার বিভিন্ন দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ক্রীট সভ্যতার প্রভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। প্রথমত, শিল্প ও স্থাপত্যে এই প্রভাব খুবই পরিষ্কার। ধর্মীয় ক্ষেত্রেও গ্রীকেরা যে খুব বেশী করিয়া মাতৃদেবীর আরাধনা করিত উহা এই

প্রভাবেরই ফল। এ-ছাড়া খেলাধূলা, সঙ্গীত এবং নৃত্যে ক্রীট সভ্যতার প্রভাব সুস্পষ্ট। এক্ষেত্রে ষাঁড়ের লড়াই, মুষ্টিযুদ্ধ, থিয়েটার এবং বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতির উল্লেখ করা চলে। এমন কি, গ্রীকদের প্রধান উৎসবও ছিল গ্রীক-পূর্ব-সভ্যতার অনুকরণ মাত্র।

হোমারের যুগে গ্রীস ঃ হোমার নামক জনৈক অন্ধ কবি রচিত ইলিয়াড ও ওডেসিতে ব্রোঞ্জযুগের মহাসমৃদ্ধ গ্রীক সভ্যতার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ইলিয়াডে ইলিয়াম বা ট্রয় নগরীর অবরোধ ও ধ্বংস বর্ণিত হইয়াছে। ওডেসিতে ওডিশিউস বা ইউলিসিস নামক এক গ্রীক বীরের ট্রয় হইতে বাড়ী ফিরিবার পথে দশ বৎসরের সমুদ্রযাত্রা বর্ণিত হইয়াছে। এই মহাকাব্যদ্বয়ে বর্ণিত ঘটনাসমূহই সেই সময়ের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের একমাত্র প্রতিচ্ছবি।



গ্রীক দেবী এথেনা

রাজনৈতিক অবস্থা

হোমারের যুগে গ্রীসদেশ বহুসংখ্যক ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সকল রাজ্য প্রায়ই পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিত। রাজা নিজেই প্রধান পুরোহিত, প্রধান বিচারক এবং প্রধান সেনাপতির কাজ করিতেন। কিন্তু রাজা যাহা

ইচ্ছা করিতে পারিতেন না। তাঁহাকে সভা ও সমিতির পরামর্শ লইয়া কাজ করিতে হইত। রাজ্যের প্রধান লোকদের লইয়া একটি সভা ছিল এবং সমস্ত জনসাধারণকে লইয়া একটি সমিতি ছিল।

সমাজ-জীবন

পরিবারই ছিল সমাজের ভিত্তি। পরিবারের উপর গৃহকর্তার অসীম ক্ষমতা ছিল। কতকগুলি পরিবার লইয়া একটি গোষ্ঠী গঠিত হইত। লোকে গ্রামে বাস করিত। তাহাদের জীবন খুব সরল ও অনাড়ম্বর ছিল। রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা সাধারণ লোকের মত নিজের নিজের কাজ নিজেরাই করিতেন। মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করিত এবং সকলেই তাঁহাদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখাইত। লোকে চাষ-আবাদ ও পশুপালন করিয়া জীবিকা অর্জন করিত। জলপথে দস্যুবৃত্তি অন্যায় ছিল না, বরং স্বাভাবিক বৃত্তি বলিয়া গণ্য হইত।



গ্রীক দেবতা জেউস

দেবদেবী

হোমারের যুগে গ্রীকগণ বিশ্বাস করিত যে, দেবতারা অলিম্পাস পর্বতের উপরে বাস করেন। বজ্রধারী জেউস ইহাদের রাজা। এথেনা ছিলেন জ্ঞান ও বুদ্ধির দেবতা, আপোল্লো ছিলেন সূর্যদেব। তাহারা বিশ্বাস করিত যে, প্রত্যেক রাজ্যের একজন অধিষ্ঠাতা দেব এবং অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছেন। যাগযজ্ঞ এবং পশুবলি প্রথারও প্রচলন ছিল।

নগর-রাষ্ট্র ঃ গ্রীস একটি পর্বতময় দেশ। এখানে পাহাড়-পর্বতের মাঝে মাঝে ছিল পরস্পরবিচ্ছিন্ন অনেকগুলি উপত্যকা। এই সকল উপত্যকায় গড়িয়া উঠিয়াছিল বহু সংখ্যক ছোট ছোট নগর। খ্রীষ্টপূর্ব

আনুমানিক নবম শতাব্দী হইতে রাজতন্ত্রের পতন শুরু হয় ও অভিজাত শ্রেণী ক্ষমতা হস্তগত করিতে থাকে। তখন হইতে নগর-রাষ্ট্রের সূত্রপাত হয়। নগরগুলির মধ্যে এথেন্স, স্পার্টা, করিন্থ ও থিব্‌স সমধিক প্রসিদ্ধ। এই নগরগুলির আপন আপন শাসনতন্ত্র ছিল। কোন নগরে রাজা শাসন করিতেন, আবার কোন নগরে প্রজারাই নিজেদের শাসন চালাইতেন। গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতি নগর-রাষ্ট্রের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান: বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত হইলেও গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদান ছিল। দেশের সর্বত্রই শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে এথেন্সের ভাষা প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক নগর-রাষ্ট্রের আপন আপন দেবতা ছিল, কিন্তু সকলেরই প্রধান দেবতা ছিলেন এক। এ-ছাড়া গ্রীসের সকল অধিবাসীই অলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গনে মিলিত হইত। এই সকল কারণে উহাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ছিল এবং ক্রমে ইহা হইতেই সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

গ্রীক উপনিবেশ বিস্তার: অষ্টম ও সপ্তম শতকের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গ্রীকজাতি ভূমধ্যসাগরের নানাস্থানে অনেকগুলি উপনিবেশ গড়িয়া তুলিয়াছিল। গ্রীকজাতির অদম্য অনুসন্ধিৎসা, সামুদ্রিক যাতায়াতে তাহাদের স্বাভাবিক নৈপুণ্য এই সকল উপনিবেশ স্থাপনে প্রেরণা যোগাইয়াছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার প্রভৃতি ইহার অন্যতম কারণ ছিল। যাহা হউক, এইভাবে এশিয়া মাইনর, ইতালি, সিসিলি, স্পেন, আফ্রিকা এবং থে্‌স ও ম্যাসিডনে গ্রীক উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। মূল ভূখণ্ডের ন্যায় এই সকল স্থানেও তাঁহারা কতিপয় নগর-রাষ্ট্র স্থাপন করিয়াছিল।

এথেন্স ও স্পার্টা—সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন: এথেন্স ও স্পার্টা এই দুইটিই ছিল প্রাচীন গ্রীসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগর-রাষ্ট্র। সেইহেতু এই দুই রাষ্ট্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা আলোচনা

করিলে তখনকার দিনের জীবনযাত্রার একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যাইবে।

এথেন্সের জীবনযাত্রা—সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস ঃ এথেন্সের স্বাধীন নাগরিকগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। যথা, সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়, কৃষকশ্রেণী এবং শ্রমজীবী। ইহারা সকলেই রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করিত। এ-ছাড়া দেশে অনেক ক্ষেতমজুর ছিল। তাহাদের কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। এদিকে সমতলক্ষেত্রের বাসিন্দা, উপকূলভাগের অধিবাসী ও পাহাড় অঞ্চলের লোকদের লইয়া আরও তিনটি শ্রেণী ছিল।

শিক্ষা-দীক্ষা ঃ এথেন্সে কোন সরকারী বিদ্যালয় ছিল না। কতকগুলি লোক শিক্ষকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের আপন আপন বিদ্যালয় ছিল। এই সকল বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা ছয় বৎসর বয়সে পড়িতে যাইত এবং সাধারণতঃ চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত পড়িত। ধনীরা ষোল বৎসর বয়স পর্যন্ত বা আরও বেশী বয়স পর্যন্ত বিদ্যালয়ে পড়িত। বিদ্যালয়ে সাধারণত ইতিহাস, সঙ্গীত ও ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হইত। পরবর্তী কালে অঙ্কন ও চিত্রবিদ্যাও শিখানো হইত।

স্ত্রীলোকদের বাড়ীতে শিক্ষা দেওয়া হইত। গৃহকর্ম শিক্ষাই তাহাদের প্রধান শিক্ষা ছিল।

অন্যান্য কাজকর্ম ঃ ষোল বৎসর বয়সে বালকেরা ব্যায়ামচর্চায় বিশেষভাবে মনোযোগ দিত। তাহারা দৌড়াইতে, লাফাইতে ও কুস্তি করিতে, শিকার করিতে, রথ চালাইতে ও বর্শা ছুঁড়িতে শিখিত। আঠার বৎসর বয়সে তাহারা নাগরিকদের কর্তব্য ও যুদ্ধ সম্বন্ধে শিক্ষা আরম্ভ করিত। দুই বৎসর ধরিয়া এই শিক্ষা চলিত। এই সময়ে তাহারা একত্রে বাস করিত; একসঙ্গে খাইত এবং একরূপ বিশেষ পোশাক পরিত। তাহারা নিজেদের শাসনের জন্য সভায় একত্রিত হইত এবং সেখানে প্রস্তাব গ্রহণ করিত এবং আইন প্রণয়ন করিত। প্রথম বৎসর তাহারা কঠোরভাবে ড্রিল করিতে শিখিত এবং সাহিত্য,

সঙ্গীত, জ্যামিতি ও অলঙ্কারশাস্ত্রের বক্তৃতা শুনিত। উনিশ বৎসর বয়সে তাহারা সীমান্তভাগের সৈন্যাবাসে প্রেরিত হইত এবং দেশরক্ষার কিংবা দেশের মধ্যে অশান্তি দূর করিবার ভার পাইত। এইভাবে শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে একুশ বৎসর বয়সে এথেন্সের যুবকগণ পূর্ণ নাগরিক অধিকার লাভ করিত।

রাজনৈতিক জীবন : এথেন্সে প্রথমে রাজার শাসন ছিল, পরে ধনিকশ্রেণী শাসনক্ষমতা দখল করিয়াছিল। দেশ শাসনের জন্য নয়জন ম্যাজিস্ট্রেট বা আর্কন ছিল। ইহারা সকলেই নির্বাচিত হইতেন। এ-ছাড়া অপর একটি সমিতির উপরেও দেশ শাসনের আংশিক দায়িত্ব অর্পিত হয়। কিন্তু পরে এথেন্সে নানা শাসন-সংস্কারের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

স্পার্টার জীবনযাত্রা : এথেন্সের তুলনায় স্পার্টার জীবনযাত্রা অনেক কঠোর ছিল। স্পার্টায় লাইকারগাস নামে একজন আইন-প্রণেতা দেশে কঠোর আইনের ব্যবস্থা করেন। যাহাতে স্পার্টার প্রত্যেক নাগরিক খুব ভাল সৈন্য হইয়া গড়িয়া উঠে, ইহাই ছিল সেই আইনের প্রধান উদ্দেশ্য।

কঠোর শিক্ষা-পদ্ধতি : সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র রাষ্ট্রের লোকেরা আসিয়া তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিত। সন্তান দুর্বল বা কানা-খোঁড়া হইলে সে যাহাতে মরিয়া যায় তজ্জন্য একটি পাহাড়ের উপর হইতে ফেলিয়া দেওয়া হইত। সন্তান যদি সুস্থ ও সবল হইত তাহা হইলে তাহাকে মায়ের কাছে ফিরাইয়া দেওয়া হইত। সাত বৎসর বয়সে বালককে বাড়ি হইতে লইয়া গিয়া বিদ্যালয়ে দেওয়া হইত। সেখানে তাহার কঠোর শিক্ষা আরম্ভ হইত। এই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শরীর ও চরিত্র গঠন করা। শরীর চর্চা ও ব্যায়াম, সঙ্গীত ও নৃত্য এই ছিল তাহার প্রধান শিখিবার বিষয়। সেই সঙ্গে তাহাকে কেবলমাত্র লিখিতে ও পড়িতে শিখানো হইত এবং সামরিক সঙ্গীত শিখানো হইত।

সামরিক শিক্ষা ঃ কুড়ি বৎসর বয়সে স্পার্টার যুবক দেশের একটি সৈন্যদলে ভর্তি হইত। তখন সে বিবাহ করিতে পারিত। কিন্তু তাহাকে সৈন্যাবাসে থাকিতে হইত। সেখানে তাহারা পনের জন একত্রে বসবাস করিত এবং প্রত্যেককে আপন আপন খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইত। তাহাদের বেশীর ভাগ সময় দেহচর্চায় এবং সামরিক ব্যায়ামে কাটিত। ত্রিশ বৎসর বয়সে সে পূর্ণ নাগরিকের মর্যাদা অর্জন করিত। কিন্তু তাহাকে ষাট বৎসর পর্যন্ত নিয়মিত সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইত।

রাজনৈতিক জীবন ঃ দেশের দুইজন রাজার উপর স্পার্টার শাসনভার অর্পিত ছিল। যদিও দেশ-চালনার প্রকৃত ক্ষমতা ছিল পাঁচজন ম্যাজিস্ট্রেট এবং বড়দের লইয়া গঠিত কাউন্সিলের হাতে। স্পার্টানগণ লেকোনিয়া অঞ্চলে বসবাস করিত। সেখানে হেলট্ এবং পেরিওকি নামক আরও দুই ধরনের লোক ছিল, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কেবলমাত্র স্পার্টার লোকেরাই শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করিতে পারিত। অন্যান্যদের কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না।

এথেন্স বনাম স্পার্টা ঃ সুপ্রাচীন কাল হইতে স্পার্টাই গ্রীক-রাষ্ট্রসমূহের নেতৃস্থানীয়রূপে সম্মানিত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু যখন গ্রীসের বিরুদ্ধে পারসীক অভিযান প্রেরিত হয় তখন স্পার্টানগণ সংকীর্ণ প্রাদেশিক মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছিল। পক্ষান্তরে এই যুদ্ধে এথেন্সের আত্মত্যাগ এবং নেতৃসুলভ মনোবৃত্তি বিভিন্ন নগর-রাষ্ট্রের গ্রীক অধিবাসিগণকে চমৎকৃত করিয়াছিল। এই স্বাধীনতাযুদ্ধে সর্বস্ব পণ করিয়া প্রথম হইতে শেষ অবধি তাহারা যেভাবে শত্রুসৈন্যের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিল তাহা সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করে। কিন্তু পারসীক যুদ্ধের সমাপ্তির পর এথেন্সের নেতৃত্বে যে রাষ্ট্রসংঘ গঠিত হইয়াছিল তাহাতে এথেন্সের প্রতিপত্তি ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরবর্তী কালে নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এথেন্স দরকারমত সংঘের শক্তি ও সামর্থ্য

এথেন্সের নেতৃত্ব ও প্রতিপত্তি

অকাতরে নিয়োগ করিত। ইহার সাহায্যেই কালক্রমে এথেন্সে তাহার বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল।

এথেন্সের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গ্রীসের বিভিন্ন রাষ্ট্রে রাজনৈতিক অসন্তোষ ক্রমশ পুঞ্জীভূত হইতেছিল। ফলে বিওসিয়া নামক একটি স্থানে এথেন্সের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূচনা হইল। রণক্ষেত্রে এথেনিয়ানগণ পরাজিত হয়। বিদ্রোহীদের এই সাফল্যের কথা ছড়াইয়া পড়িলে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া এথেন্স-বিরোধী বিদ্রোহ দেখা দিল। এই সুযোগে স্পার্টা এথেন্সের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হইল। ত্রিশ বৎসরের চুক্তিদ্বারা এই সকল বিদ্রোহ প্রশমিত হইলেও স্পার্টা ও এথেন্সের মধ্যে নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব ক্রমশ এক বিরাট যুদ্ধে পরিণত হয়। সেই বিখ্যাত যুদ্ধ পেলোপোনেসিয়ান যুদ্ধ নামে পরিচিত। গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক থুকিদীদিস্ এই যুদ্ধের কাহিনী অবলম্বন করিয়া 'পেলোপোনেসিয়ান যুদ্ধের ইতিহাস' রচনা করিয়াছিলেন।

পেলোপোনেসীয় যুদ্ধের স্থচনা



পেরিক্লিস্

যুদ্ধ ও ফলাফল: খ্রীষ্টপূর্ব ৪৩১ হইতে ৪০৪ অব্দ অর্থাৎ ২৭ বৎসর-ব্যাপী পেলোপোনেসিয়ান যুদ্ধ চলিয়াছিল। এই যুদ্ধে পরিশেষে এথেন্স পরাজিত হয়। এথেন্স তখন স্পার্টার অধীনে একটি সামান্য রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

এথেন্সের সাংস্কৃতিক গৌরব

পেরিক্লিস্: বিখ্যাত রাষ্ট্র-নায়ক পেরিক্লিস্ ত্রিশ বৎসরকাল এথেন্সের সর্বময় কর্তা ছিলেন। শিক্ষা-দীক্ষায় তিনি ছিলেন সাধারণ ব্যক্তিদের বহু ঊর্ধ্বে। তাঁহার বাগ্মিতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার কথা আজও স্মরণীয়। এথেন্সকে তিনি

ঐক্যবদ্ধ গ্রীসের প্রাণকেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার আমলে এথেন্স পেলোপোনেসিয়ান যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ সুশাসনের ফলে গ্রীক সাহিত্য, শিল্পকলা ও ভাস্কর্যের অভূতপূর্ব উন্নতি হইয়াছিল। তাই গ্রীক সংস্কৃতির ইতিহাসে পেরিক্লিসের যুগ এক স্মরণীয় অধ্যায়।

সাহিত্য ঃ সাহিত্যের ক্ষেত্রে পেরিক্লিসের যুগ সুবর্ণযুগ বলিয়া পরিচিত। এই যুগে গ্রীক নাটকের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে। ঈসকাইলাস, সোফোক্লেস, ইউরিপিডিজ, আরিস্তোফানেস প্রভৃতি নাট্যকারগণ প্রচলিত উপাখ্যান হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া অনেকগুলি ভাল নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। সোফোক্লেস একজন অনন্যসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার রচিত ১১৩ খানি নাটকের মধ্যে মাত্র ১৩ খানির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সেগুলির মধ্যে 'রাজা ওয়াদিপাউস' আজও সমাদৃত। এ-ছাড়া গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ মিলনান্ত নাটকের রচয়িতা আরিস্তোফানেসও একজন শক্তিমান নাট্যকার ছিলেন। সংগীত, নৃত্য, অভিনয়-সংলাপ, কাব্য ও চিন্তা—এই সকলের সমন্বয়ে গ্রীক নাটক এক অপূর্ব শিল্পসৃষ্টি।

নাটক



সোফোক্লেস

নাটক ছাড়া গদ্য রচনার ক্ষেত্রেও গ্রীকদের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পারস্য ও গ্রীসের মধ্যে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া হেরোডোটাস্ (খ্রীঃ পূঃ ৪৮৪—৪২৮ অব্দ) এক বিখ্যাত

গদ্য-সাহিত্য

ইতিহাস রচনা করেন। তাঁহার এই গ্রন্থ বহুদিন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, শুধু তাহার কিছু অংশের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। গ্রীসের কথা ছাড়াও সুমের ও ব্যাবিলনের পুরাকাহিনী পাওয়া যায়। পেরিক্লিসের যুগে ঐতিহাসিক থুকিদীদিস্ প্রথম রাজনৈতিক ইতিহাস রচনা করেন। তাঁহার অসম্পূর্ণ রচনা 'পেলো-পোনেসীয় যুদ্ধে'র ঐতিহাসিক মূল্য আজও অক্ষুণ্ণ আছে।



হেরোডোটাস্

দর্শন ঃ- সেই সময়ে এথেন্সে বড় বড় দার্শনিকের জন্ম হইয়াছিল। সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ছিলেন সক্রেটিস্ (আনু. খ্রীঃ পূঃ ৩৬৯—৩৯৯ অব্দে)। তাঁহার জন্মস্থান এথেন্স। তিনি সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করিতেন এবং অনেককে অনেক প্রশ্ন করিতেন। সেই সব প্রশ্নের উত্তর পাইলে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করিতেন এবং এই ভাবে প্রশ্নের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত

সক্রেটিস্



সক্রেটিস্

হইত। ক্রমে বহু যুবক সক্রেটিসের শিষ্য হইয়া জ্ঞানলাভের জন্য সারাদিন তাঁহার পিছনে পিছনে ঘুরিতে লাগিল। এই যুবকদের তিনি এথেন্সের তৎকালীন জাঁকজমকে না ভুলিয়া ন্যায় ও সততার পথে চলিতে উপদেশ দিতেন। কিন্তু শীঘ্রই এথেন্সের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি সক্রেটিসের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ আনিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, সক্রেটিস্ যুবকদিগকে কুশিক্ষা দিয়া ভুলপথে চালাইতেছেন। বিচারে সক্রেটিসের প্রাণদণ্ড হইল। সক্রেটিস্ হাসিমুখে হেমলক বিষ পান করিয়া দেহত্যাগ করিলেন।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ঃ মৃৎপাত্রে অঙ্কিত চিত্র ছাড়া গ্রীক চিত্রকলার আর কোন নিদর্শন নাই। এই শিল্প অতি অল্প সময়ের মধ্যে আশ্চর্য উন্নতি লাভ করে। এ-যুগের গ্রীক স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সত্যই এক অপূর্ব কীর্তি। এথেন্সের নগর-দুর্গ আক্রোপোলিশে যে স্থাপত্যকর্ম আছে,



মৃৎপাত্রে অঙ্কিত চিত্রকলা

তাহা সৌন্দর্যে ও গম্ভীর মহিমায় অবিনশ্বর। পার্থেনন আজও আমাদের এথেনীয় সাম্রাজ্যের গৌরব স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহা এথেন্সের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এথেনার মন্দির। ইহা এখনও ভগ্নাবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে। এই মন্দিরে এথেনা দেবীর সোনার ও হাতীর দাঁতের উৎকৃষ্ট মূর্তি ছিল; এথেন্সের পাথরের মূর্তিগুলিও সুবিখ্যাত সুপ্রসিদ্ধ ভাস্কর

প্রাক্সিটালিজ পাথরের মূর্তিতে যেরূপ সৌন্দর্য ও কমনীয়তা ফুটাইয়া তুলিতেন সেরূপ আর কেহ পারিত না।

ম্যাসিডনের উত্থান

সূচনা : গ্রীসের উত্তরভাগে ম্যাসিডন রাজ্য। এতকাল ম্যাসিডনের কথা বিশেষ শোনা যাইত না, কারণ গ্রীসের অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। পেলোপোনেসীয় যুদ্ধের পর স্পার্টা ও এথেন্স উভয়েই হীনবল হইয়া পড়ে। ম্যাসিডনে থেব্‌সের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। কিন্তু ম্যাসিডনের অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশই ছিল দুর্ধর্ষ সামরিক জাতি। ফলে অতি অল্পকাল পরেই তাহারা থেব্‌সের প্রাধান্য অস্বীকার করে এবং ম্যাসিডনের রাজবংশের সন্তান ফিলিপের নেতৃত্ব স্বীকার করে। খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫৬ অব্দে ফিলিপ ম্যাসিডনে সিংহাসনে আরোহণ করেন। অবিরাম যুদ্ধ করিয়া ফিলিপ ক্ষুদ্র ম্যাসিডন রাজ্যকে এক বিশাল শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। গ্রীসের সর্বত্র তাঁহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর তিনি স্থির করিলেন যে, এবার তিনি পারস্য সাম্রাজ্য আক্রমণ করিবেন। কিন্তু হঠাৎ এক আততায়ীর হস্তে তাঁহার মৃত্যু হইল।



আলেকজাণ্ডার

আলেকজাণ্ডার : ফিলিপের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আলেকজাণ্ডার মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে ম্যাসিডনের রাজা হন। অতঃপর খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩৪ অব্দে তিনি তাঁহার ইতিহাস-বিশ্রুত দিগ্‌বিজয়ে বাহির হইলেন। প্রথমে তিনি পারস্য সাম্রাজ্যের এক বিস্তীর্ণ এলাকা জয় করিয়া খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম

করিয়া সিন্ধু উপত্যকায় আসিয়া উপস্থিত হন। ভারতের উত্তর-



পশ্চিমে তখন নানা উপজাতি বাস করিত। কতকগুলি উপজাতি

সহজেই আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করিল আর কতকগুলি ভীষণ যুদ্ধ করিল।

খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৬ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আলেকজাণ্ডার সিন্ধু নদ অতিক্রম করিয়া তক্ষশিলায় উপস্থিত হইলেন। তক্ষশিলার রাজা অম্ভি আলেকজাণ্ডারকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং নিজের সৈন্য দিয়া সাহায্য করিলেন।

পুরুরাজ : তক্ষশিলার পূর্বদিকে একটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল। সেই রাজ্যের রাজা ছিলেন পুরু (পৌরব)। দুইটি রাজ্যের মধ্য দিয়া ঝিলাম নদী প্রবাহিত হইত। ঝিলাম নদীর এক পারে আলেকজাণ্ডার তাঁহার সৈন্য সজ্জিত করিলেন। অপর পারে পুরু তাঁহার সৈন্য লইয়া যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বর্ষার জলে নদীবক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল। আলেকজাণ্ডার দেখিলেন, সোজাসুজি নদী পার হওয়া অসম্ভব, তাই তিনি গোপনে নদী পার হইবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। শেষে একরাত্রে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে আলেকজাণ্ডার প্রায় ষোল মাইল দূরে একস্থানে নদী পার হইলেন এবং সহসা পুরুর শিবির আক্রমণ করিলেন। পুরু এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। পুরুর সৈন্যবাহিনীতে অনেক হাতী ছিল। গ্রীক সৈন্যরা অনবরত তীর ছুঁড়িয়া হাতিগুলিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলে হাতিগুলি ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইতে লাগিল। সেই সুযোগে ম্যাসিডনের অশ্বারোহী সৈন্য প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করিল। পুরু একটি হাতির পিঠে চড়িয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। তিনিও ভীষণভাবে আহত হইলেন। এই অবস্থায় পুরুকে বন্দী করা হয়। আলেকজাণ্ডারের সম্মুখে বন্দী অবস্থায় নীত হইলে তিনি পুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কিরূপ ব্যবহার আশা করেন ?" পুরু গর্বভরে উত্তর দিলেন, "রাজার মত"। এই উত্তরে প্রীত হইয়া আলেকজাণ্ডার পুরুকে তাঁহার রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন এবং বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন।

পুরুর বীরত্ব

প্রত্যাবর্তন : আলেকজাণ্ডার মগধ রাজ্য পর্যন্ত আপন অধিকার বিস্তার করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু রণক্লান্ত গ্রীক সৈন্য বিতস্তা নদী অতিক্রম করিতে চাহিল না। ফলে আলেকজাণ্ডার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে মনস্থ করিলেন। অধিকাংশ সৈন্য জলপথে প্রেরণ করিয়া তিনি স্বয়ং কতিপয় সৈন্য লইয়া স্থলপথে গ্রীস অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে ব্যাবিলনে মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু ঘটে (খ্রীঃ পূঃ ৩২৩ অব্দ)।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। তাঁহার সেনাপতিগণ নিজেদের মধ্যে এই সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া লইলেন।

গ্রীসের উপর রোমের আধিপত্য : ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে যখন রোমের আধিপত্য ক্রমশ বিস্তার লাভ করিতেছিল সেই সময় ম্যাসিডনের সহিত রোমের যুদ্ধ বাধিয়াছিল। তখন পঞ্চম ফিলিপ ম্যাসিডনের রাজা ছিলেন। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তিনি ম্যাসিডনের বাহিরে গ্রীসের অন্যান্য স্থানে তাঁহার আধিপত্যের অবসান ঘোষণা করিতে বাধ্য হন। ফিলিপের মৃত্যুর পর ম্যাসিডন আবার আক্রান্ত হইয়াছিল। যুদ্ধে রোমানরা জয়ী হইয়া ম্যাসিডনকে চারিভাগে বিভক্ত করে। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে স্থানীয় বিক্ষোভ দেখা দিলে ম্যাসিডনের স্বাধীনতা বিনষ্ট করিয়া তথায় রোমের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

অনুশীলনী

১। হোমারের যুগে গ্রীসের জীবনযাত্রা সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

২। গ্রীসের নগর-রাষ্ট্র ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩। এথেন্সের জীবনযাত্রা সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৪। স্পার্টার সামরিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা কর।

৫। কি কারণে এথেন্সের সহিত স্পার্টার সংঘর্ষের সূচনা হইয়াছিল ?

৬। পেরিক্লিস কে ছিলেন ? তাঁহার সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৭। গ্রীসের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখ।

৮। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন :

১। হোমার কি কি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন ?

২। হোমারের যুগে গ্রীসের দেবদেবী সম্পর্কে কি জান ?

৩। গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কি কি কারণে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের সূচনা হইয়াছিল ?

৪। এথেন্সের বালকদের কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হইত ?

৫। লাইকারগাস কে ছিলেন ?

৬। এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে কোন্ বিখ্যাত যুদ্ধের সূচনা হইয়াছিল ? এই যুদ্ধের ফলে কে পরাজিত হইয়াছিল ?

৭। সক্রেটিস্ সম্পর্কে কি জান ? কি কারণে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল ?

৮। সফোক্লিস কে ছিলেন ? হেরোডোটাস কিজন্য বিখ্যাত ? কে পেলোপোনেসিয়ান যুদ্ধের ইতিহাস রচনা করেন ?

৯। ভারতীয় কোন্ নৃপতির সহিত আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধ হইয়াছিল ? এই যুদ্ধের ফলাফল কি হইয়াছিল ?

১০। কিভাবে গ্রীসে রোমের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় ?

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। ঈজিয়ান সাগরে — একটি অন্যতম প্রধান দ্বীপ।

২। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার বিভিন্ন দিকে দৃষ্টিপাত করিলে — সভ্যতার প্রভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

৩। হোমারের যুগে গ্রীসদেশে বহুসংখ্যক — বিভক্ত ছিল।

৪। গ্রীকগণ বিশ্বাস করিত যে, দেবতারা — পর্বতের উপরে বসবাস করেন।

৫। — এই দুইটিই ছিল গ্রীসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগর-রাষ্ট্র।

৬। বিখ্যাত রাষ্ট্রনায়ক — ত্রিশ বৎসরকাল এথেন্সের সর্বময় কর্তা ছিলেন।

৭। খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫৬ অব্দে — ম্যাসিডনের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

৮। পুরুষ সৈন্যবাহিনীতে অনেক — ছিল।

———

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রোমের উত্থান কাহিনী

সূচনা: প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে ইতালিতে টাইবার নদীর তীরে রোম নামে একটি নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। রোমের অধিবাসীরা ল্যাটিন ভাষায় কথা বলিত। এই ল্যাটিন ভাষাও একটি প্রাচীন আর্য ভাষা। রোম একটি প্রাচীন নগর। রোমের আধিবাসীদিগের নাম রোমান।

রোম নগরীর উৎপত্তি: খ্রীষ্টপূর্ব ১২০০ অব্দে যখন ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিসমূহ এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল, তখন উহাদেরই একটি শাখা পশ্চিম দিকে চলিয়া যায় এবং ইতালিতে বসবাস শুরু করে। ইতালিতে বসবাসকালে উহারা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ইহাদের মধ্যেই একদলকে ল্যাটিন জাতি বলিয়া অভিহিত করা হইত। ইহারাই কালক্রমে রোম নগরীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

রোমের প্রাচীন কাহিনী ও কিংবদন্তীতে রোমের উত্থান সম্পর্কে একটি সুন্দর গল্প আছে।

রমিউলাস ও রিমাস নামে দুই যমজ ভাই এক রাজার দৌহিত্র ছিলেন। ইহারা যখন খুব ছোট সেই সময়ে সেই রাজার ভ্রাতা রাজাকে তাড়াইয়া দেন এবং তাঁহার সৈন্যদের দৌহিত্র দুইটিকে টাইবার নদীর জলে ফেলিয়া দিতে হুকুম দেন। কিন্তু সৈন্যরা ঘুমন্ত শিশু দুইটির দোলনাখানি নদীর এক অগভীর অংশে ফেলিয়া দেয়। দোলনাখানি ঢেউ-এ ভাসিতে ভাসিতে একটি ডুমুর গাছের তলায় কাদায় আটকাইয়া যায়। সেখান হইতে একটি নেকড়ে বাঘ শিশু দুইটিকে তুলিয়া লইয়া যায় এবং নিজের দুধ দিয়া পালন করিতে থাকে।

একদিন এক মেষপালক এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া শিশু দুইটিকে ঘরে লইয়া গেল এবং তাহাদিগকে নিজের ছেলের মত মানুষ করিতে লাগিল। বড় হইয়া দুই ভাই একদল দুর্দান্ত পাহাড়িয়া যুবক সংগ্রহ

করিয়া তাহাদের দলপতি হইলেন। তারপর তাঁহারা স্থির করিলেন যে, টাইবার নদীর দক্ষিণ তীরে যে সাতটি পাহাড় আছে তাহারই একটির উপর তাঁহারা এক নূতন শহর গড়িয়া তুলিবেন, কিন্তু প্রথমেই দুই ভ্রাতার মধ্যে কলহ উপস্থিত হইল এবং রমিউলাস রিমাসকে হত্যা করিলেন। তারপর রমিউলাস তাঁহার নূতন শহর গড়িয়া তুলিলেন। রমিউলাসের নাম অনুযায়ী শহরটির নাম হইল রোম।

রাজ্যবিস্তার ঃ দিন দিন রোম নগরীর খুব উন্নতি হইতে লাগিল। সেই সময় ইতালিতে আরও অনেক নগর ও জাতি ছিল। কিন্তু রোম যুদ্ধে আর সকলকে পরাস্ত করিয়া ইতালির উপর নিজের প্রভুত্ব স্থাপন করিল।

রোম ও কার্থেজের সংঘর্ষ ঃ এদিকে রোম যখন ইতালিতে প্রভুত্ব স্থাপন করিতেছিল, সেই সময়ে ফিনিসীয় বণিকেরা কার্থেজ নামে একটি শক্তিশালী নগর প্রতিষ্ঠা করে।

এই শহর ভূমধ্যসাগরের উপকূলে উত্তর-আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। সমৃদ্ধ বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হিসাবে কার্থেজ অত্যন্ত শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ নগর হইয়া উঠিয়াছিল। রোমের ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত সিসিলি দ্বীপের অধিকাংশ কার্থেজ অধিকার করিয়াছিল। এক্ষণে সিসিলি ও ইতালির মধ্যে যে সঙ্কীর্ণ প্রণালী আছে কার্থেজ ও রোম উভয়েই উহার উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে চেষ্টিত হইল।

এইভাবে কার্থেজ ও রোম এই দুইটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ইহার ফলে রোম ও কার্থেজের মধ্যে তিনবার যুদ্ধ হইয়াছিল। প্রথম যুদ্ধ প্রায় পঁচিশ বৎসর ধরিয়া চলিল। তখন কার্থেজের খুব বড় বড় যুদ্ধজাহাজ ছিল, কিন্তু রোমের যুদ্ধ-জাহাজ ছিল না। শীঘ্রই রোমানরা খুব ভাল ভাল যুদ্ধজাহাজ তৈয়ারি করিয়া ফেলিল। অবশেষে কার্থেজ ভীষণভাবে পরাস্ত হইল; তাহাকে সিসিলি ও অন্যান্য অনেক স্থানের অধিকার ছাড়িয়া দিতে হইল।

হ্যানিবল ঃ তারপর কুড়ি বৎসর শান্তিতে কাটিল। এই সময়ে

কার্থেজে একজন খুব বড় যোদ্ধা ছিলেন, তাঁহার নাম হ্যামিলকার বার্কা। রোমের হাতে স্বদেশের শোচনীয় পরাজয়ে হ্যামিলকারের মনে কষ্ট হইয়াছিল। তিনি শপথ লইয়াছিলেন, শত্রুর উপর প্রতিশোধ লইবেন। তাঁহার বিখ্যাত পুত্র হ্যানিবলের বয়স যখন নয় বৎসর তখন তিনি পুত্রকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে, সারাজীবন সে যেন রোমকে ঘৃণা করে এবং রোমের সহিত যুদ্ধ করে।

শীঘ্রই হ্যানিবলের শপথ পালন করিবার সুযোগ উপস্থিত হইল। রোমের সহিত কার্থেজের আবার যুদ্ধ বাধিল। রোমানরা ভাবিয়াছিল যে, স্পেনে গিয়া তাহারা হ্যানিবলকে আক্রমণ করিবে, কিন্তু সেখানে গিয়া তাহারা দেখিল যে, হ্যানিবল আগেই সৈন্যবাহিনী লইয়া রোম আক্রমণ করিতে যাত্রা করিয়াছেন। হ্যানিবল পীরেনীজ পর্বত পার হইয়া দক্ষিণ-ফ্রান্সের ভিতর দিয়া আসিয়া আল্পস্ পর্বতে উপনীত হইলেন। সৈন্যগণ ধীরে ধীরে অতি কষ্টে পর্বতে আরোহণ করিতে লাগিল, অনাহারে ও কঠোর শীতে দিন দিন তাহাদের সংখ্যা কমিতে লাগিল। অবশেষে হ্যানিবল আল্পস্ পর্বতের চূড়ায় উঠিয়া সৈন্যদিগকে বলিলেন যে, এইবার তাহাদের কষ্টের অবসান হইয়াছে ; তাহারা সহজেই ঢালু পর্বতগাত্র বাহিয়া ইতালিতে অবতরণ করিবে। কিন্তু ঢালু পর্বতগাত্রেই আরও বেশী সৈন্য মারা গিয়াছিল।

তারপর পনের বৎসর ধরিয়া হ্যানিবল ইতালির একধার হইতে আর একধার পর্যন্ত অভিযান করিলেন ; একটির পর আর একটি রোমান বাহিনীকে পরাস্ত করিলেন। তিনি নিজে কখনও পরাস্ত হন নাই। কিন্তু দিন দিন হ্যানিবলের শক্তি কমিতে লাগিল। তিনি কার্থেজ হইতে নূতন কোন সাহায্য পাইলেন না। এদিকে সিপিও নামে এক রোমান সেনাপতি যুদ্ধের কৌশল সম্পূর্ণ বদলাইয়া দিলেন ; তিনি কার্থেজ আক্রমণ করিয়া কার্থেজের সৈন্যবাহিনীকে বিধ্বস্ত করিলেন।

ইহাতে কার্থেজের অধিবাসিগণ ভীষণ বিপদে পড়িয়া হ্যানিবলকে স্বদেশে ফিরিতে আহ্বান জানাইল। হ্যানিবল দেশে ফিরিয়া একদল নূতন সৈন্য লইয়া রোমান বাহিনীর সম্মুখীন হইলেন। এইবার তাঁহার প্রথম ও শেষ পরাজয় ঘটিল। কার্থেজ পরাস্ত হইয়া সন্ধি করিল।

হ্যানিবল পলাইয়া গেলেন, কিন্তু শেষে যখন দেখিলেন যে, শত্রুর হাত হইতে রক্ষা পাইবার আর কোন উপায় নাই, তখন তিনি বিষপান করিয়া আত্মহত্যা করিলেন।

কার্থেজের ধ্বংস-সাধন: সেই সময়ে রোমের সেনেটে কেটো নামে একজন সভ্য ছিলেন। যখনই তিনি কোন বক্তৃতা শেষ করিতেন তখনই বলিতেন, "কার্থেজকে ধ্বংস করিতেই হইবে।" তাঁহার মনে ভয় ছিল যে, কার্থেজ আবার হয়তো বড় হইয়া রোমকে ধ্বংস করিবে। শেষে রোম অন্যায় করিয়া কার্থেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। কার্থেজ নগরীকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া ধূলিসাৎ করা হইল।

রোমের শাসনব্যবস্থা

রাজতন্ত্র হইতে প্রজাতন্ত্র: প্রথমে রোমে রাজারা শাসন করিতেন। ক্রমে রাজারা অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন। অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিলে লোকে রাজাকে তাড়াইয়া দিল। তারপর তাহারা রাজার বদলে নিজেদের মধ্য হইতে দুইজন শাসক বা কনসাল নির্বাচন করিল। এইভাবে রোমে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। কনসালদিগকে শাসনকার্যে পরামর্শ দিবার জন্য দেশের প্রধান প্রধান লোকদের লইয়া একটি সভা গঠিত হইল। এই সভাকে বলা হইত সেনেট।

শ্রেণী সংঘর্ষ: রোমের সমাজ ব্যবস্থায় দুইটি পৃথক শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছিল। একদল ছিল বিশেষ অধিকার-ভোগী। ইহারা ছিলেন অনেক বিষয়-সম্পত্তির মালিক এবং বেশ ধনী। অপরদিকে ছিল সাধারণ লোক, যাহাদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল

গরীব চাষী ও শ্রমজীবী। তাহাদের নাগরিক অধিকার ছিল। কিন্তু অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা অনেক কম ছিল।

প্রথমদিকে এই সব সাধারণ লোকের নানা অসুবিধা ছিল। তাহারা নিম্নশ্রেণীর লোক বলিয়া গণ্য হইত। তাহারা দেশের শাসনকার্যে খুব বেশী অংশ লইতে পাইত না। কারণ সামরিক মর্যাদা এবং অর্থনৈতিক প্রতিপত্তিই ছিল ইহার মাপকাঠি। বড় বড় চাকুরী হইতেও তাহারা বঞ্চিত হইত। বস্তুত দেশের সমস্ত বড় বড় চাকুরীই তখন বিশেষ অধিকার-ভোগীদের দখলে চলিয়া গিয়াছিল। এছাড়া সেনেটের সদস্য পদগুলিতেও ছিল তাহাদেরই একচেটিয়া অধিকার। ফলে সাধারণ লোকেরা ক্রমেই গরীব হইয়া পড়িতেছিল। তাহারা বিশেষ অধিকার-ভোগী লোকদের নিকট ঋণ করিত, আর দেনা শোধ করিতে না পারিলে ক্রীতদাস হইয়া থাকিত। এই সকল কারণে তাহারা খুব অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। শেষে বিশেষ অধিকার-ভোগীদের সঙ্গে কলহ করিয়া তাহারা রোম হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহারা বলিল যে, তাহারা আর রোমে ফিরিয়া আসিবে না ; অন্য আর এক স্থানে বসবাস করিবে।

এদিকে এই সময় ল্যাটিন জাতির একটি শাখা রোম আক্রমণে উদ্যত হইলে বিশেষ অধিকার-ভোগীরা খুব মুশকিলে পড়িলেন। সেনেট দায়ে ঠেকিয়া নূতন আইন করিয়া সাধারণ মানুষদের জন্য কিছু ভাল ব্যবস্থা করিল। কিন্তু দুই শ্রেণীর মধ্যে অধিকার লইয়া প্রায়ই কলহের সৃষ্টি হইত। শেষ পর্যন্ত স্থির হইল যে, রোমের যে-কোন নাগরিক, ধনী হউক আর গরীবই হউক, উপযুক্ত হইলে উচ্চপদ লাভ করিবে।

নাগরিকত্ব অর্জন ঃ রোমে বেশ কিছু জমির মালিকানাস্বত্ব থাকিলে তবেই নাগরিকত্ব অর্জন করা যাইত। এইজন্য একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে নাগরিকত্ব সীমাবদ্ধ ছিল। দেশের সাধারণ লোকেরা এজন্য বিক্ষুব্ধ ছিল। শেষে গ্রাক্কাস ভ্রাতৃদ্বয় বলিয়া অভিহিত সম্ভ্রান্তশ্রেণীর দুইজন লোক রোমের নাগরিকত্ব সম্প্রসারণের জন্য সেনেটে প্রস্তাব

উত্থাপন করিয়া ব্যর্থ হন। তাঁহারা উভয়েই নিহত হন, কিন্তু ইতিমধ্যে সাধারণ লোক নাগরিকত্ব অর্জনের জন্য আরও সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল। এই সঙ্গে রোমের ইতালীয় মিত্র রাজ্যসমূহের অধিবাসিগণ নাগরিকত্ব অর্জনের উদ্দেশ্যে আন্দোলন শুরু করিলে এক ব্যাপক গৃহযুদ্ধের সূচনা হইল। রোম তখন বাধ্য হইয়া নাগরিকত্ব সম্প্রসারিত করিল।

ক্রীতদাস সমস্যা ও বিদ্রোহ ঃ বিভিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে রোমে ক্রীতদাসের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। আগে যে সকল লোক কৃষিকর্মে লিপ্ত ছিল তাহারা ক্রমশ শহরাঞ্চলে চলিয়া গিয়াছিল। কারণ শহরে ভাল ভাল কাজকর্ম জুটিত এবং সেখানে বেশ আনন্দে দিন কাটিত। ফলে ইতালির অধিকাংশ গ্রামেই ক্রীতদাসদের সাহায্যেই কৃষিকার্য ও পশুপালন চলিতেছিল। কিন্তু এই সকল ক্রীতদাসদের প্রতি রোমের অধিবাসীরা অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিত। ফলে তাহাদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল। এই অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইয়া ক্রমে বিদ্রোহের আকার ধারণ করিল। খ্রীষ্টপূর্ব ৭১ অব্দে থ্রেসের বিখ্যাত বীর স্পার্টাকাস এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়াছিলেন।



রোমের ক্রীতদাস

স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে প্রায় দুই বৎসরকাল রোমে ক্রীতদাস বিদ্রোহ তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল। পরিশেষে অতি নিষ্ঠুরভাবে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়। স্পার্টাকাস ধৃত হইলে তাঁহাকে

হত্যা করা হয়। এই বিদ্রোহের সহিত জড়িত থাকিবার অভিযোগে ছয় হাজার ক্রীতদাসকে জীবন্ত ক্রুশবিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল।

অনুশীলনী

১। রোমের সহিত কার্থেজের সংঘর্ষের কারণ ও যুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা কর।

২। প্রজাতন্ত্রের আমলে কিভাবে শ্রেণী-সংঘর্ষের সূচনা হইয়াছিল? ইহার ফলাফল কি হইয়াছিল?

৩। কিভাবে রোম নগরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। কার্থেজ কোথায় অবস্থিত? হানিবল কে ছিলেন?

২। স্পার্টাকাস কে ছিলেন?

৩। রোমে কিভাবে নাগরিকত্ব অর্জনকে কেন্দ্র করিয়া বিক্ষোভ ও আন্দোলন শুরু হইয়াছিল?

৪। রোমে ক্রীতদাসদের অবস্থা কিরূপ ছিল?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১। রোমের অধিবাসীদের নাম —।

২। — নামে দুই যমজ ভ্রাতা এক রাজার দৌহিত্র ছিলেন।

৩। প্রথম রোমে — শাসন করিতেন।

৪। রোমের সমাজ ব্যবস্থায় — শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছিল।

৫। ইতালির অধিকাংশ গ্রামেই — সাহায্যেই কৃষিকার্য ও পশুপালন চলিতেছিল।

৬। — নেতৃত্বে প্রায় দুই বৎসরকাল রোমে ক্রীতদাসদের বিদ্রোহ তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল।

চতুর্দশ অধ্যায়

জুলিয়াস্ সীজার—রোমান সাম্রাজ্য

প্রজাতন্ত্রের অবসান : প্রজাতন্ত্রের শাসনকালে রোমের সাম্রাজ্য অনেক বাড়িয়াছিল, কিন্তু অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্রমেই প্রকট হইয়া উঠিতেছিল।

রোমের শাসন ব্যাপারে পরামর্শ-দানই ছিল সেনেটের প্রধান কাজ, কিন্তু ক্রমশ এই সভা সরাসরিভাবে দেশ শাসন করিতে লাগিল। সেনেটের সদস্যবর্গ দেশের সর্বেসর্বা হইয়া উঠিল এবং দেশবাসীও উহাদের উপঢৌকন দিয়া নানা সুযোগ-সুবিধা লইতে লাগিল। যে কেহ সেনেটের বিরাগভাজন হইত তাহাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইত। এই অবস্থায় দেশে ভিন্ন ভিন্ন দল ও দলনেতার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল।

এই সকল নেতৃবৃন্দের মধ্যে পম্পীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি খুব বড় যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু সামরিক গুণাগুণ থাকিলেও অভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা দমন করিবার মত যোগ্যতা তাঁহার ছিল না।

জুলিয়াস্ সীজার : রোমের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত করিবার যোগ্যতা ছিল একমাত্র জুলিয়াস্ সীজারের। খ্রীষ্টপূর্ব ৬১ অব্দের কোন এক সময়ে তিনি স্থির করেন যে, প্রথমত, তিনি রোমের শাসন কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করিবেন এবং দ্বিতীয়ত, পরিবর্তন যাহাই হউক না কেন, ইহাতে পশ্চাতে যেন সামরিক বাহিনীর পূর্ণ সমর্থন থাকে। তাই প্রথমেই তিনি একদল সৈন্য লইয়া গল দেশ বা বর্তমান ফ্রান্সে রোমের নগরপালরূপে শাসন শুরু করিলেন।

তিনি দুইবার বৃটেন আক্রমণ করেন এবং পরিশেষে গল দেশ জয় করেন। এই সঙ্গে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। এই অর্থ দিয়া তিনি রোমের নামী-দামী লোকদের বশীভূত করেন।

সীজার কিছুদিন পম্পীর সহিত যুগ্মভাবে কাজ করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমে ক্রমে উহাদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হইল। শেষে পম্পীর দলবল সীজারের বন্ধুদের আক্রমণ করিলে সীজার তাঁহার সৈন্যদের লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। পম্পী ভয় পাইয়া পলাইয়া গেলেন। এইভাবে সীজার রোম দখল করিলেন। পম্পী মিশরে আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং সেখানে তিনি নিহত হন। অতঃপর সীজার মিশর জয় করিয়া এশিয়ার দিকে অগ্রসর হন। খ্রীষ্টপূর্ব ৪৫ অব্দে সীজার রোম সাম্রাজ্যের অবিসংবাদিত প্রধান হইলেন।



জুলিয়াস্ সীজার

এইবার সীজার শাসন সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার শাসনকালে আরও অনেক স্থানে উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি কয়েকটি জনহিতকর কাজেও হাত দিয়াছিলেন। কিন্তু রোমের অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে অনেকেই সীজারের শাসনে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁহারা বলিলেন, "সীজার রাজা হইবার চেষ্টা করিতেছেন।" সুতরাং তাঁহারা সীজারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিলেন। রোমে তখনও আইনত প্রজাতন্ত্র অক্ষুণ্ণ ছিল এবং সেনেটের সভা হইত। ফলে সীজার যখন সেনেটের সভায় উপস্থিত হইলেন তখন চারিদিক হইতে সেনেটের সভ্যগণ আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং ছুরিকাঘাতে হত্যা করিলেন (খ্রীঃ পূঃ ৪৪ অব্দ)।

সম্রাট অগাস্টাস ঃ সীজারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল, কিন্তু এই সঙ্গে প্রজাতন্ত্র তথা সেনেটের শাসনও ভাঙ্গিয়া পড়িল। সীজারের মৃত্যুর পর তের বৎসর ধরিয়া নানা গৃহবিবাদ চলিল। শেষে সীজারের ভগিনীর পৌত্র অক্টেভিয়ান শাসনক্ষমতা লাভ করিলেন। অক্টেভিয়ানই রোমের প্রথম সম্রাট ; যদিও তিনি এই উপাধি গ্রহণ করেন নাই। রোমের সেনেট তাঁহাকে "অগাস্টাস" উপাধিতে ভূষিত করেন (খ্রীঃ পূঃ ২৭ অব্দ)।



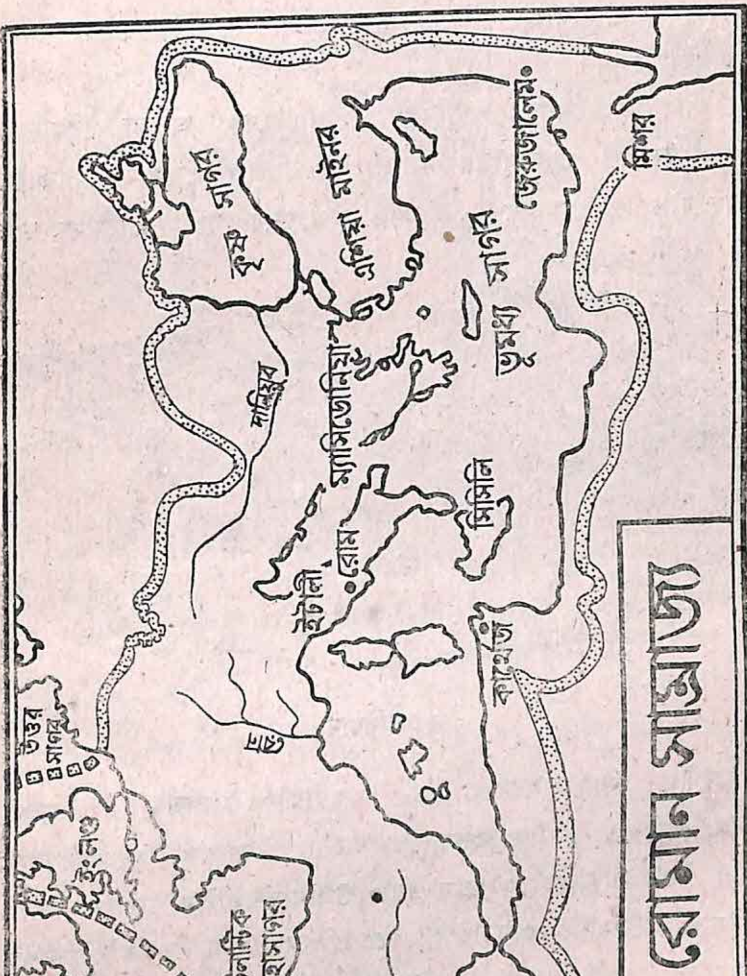
সম্রাট অগাস্টাস

অগাস্টাস যুদ্ধবিগ্রহ না করিয়া অভ্যন্তরীণ উন্নয়নে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার রাজত্বকালেই বিখ্যাত ঐতিহাসিক লিভি এবং মহাকবি ভার্জিল ও হোরেসের আবির্ভাব হইয়াছিল। আর এই সময়ই রোমান সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে পরম পুরুষ যীশুখ্রীষ্টের জন্ম হইয়াছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ১৪ অব্দে অগাস্টাসের মৃত্যু হয়।

পরবর্তী রোমান সম্রাটদের মধ্যে নিষ্ঠুর সম্রাট ক্যালিগুলার খামখেয়ালীর অন্ত ছিল না। সম্রাট নিরোর রাজত্বকালে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে রোম নগরী ধ্বংস হয়, কিন্তু রোম যখন পুড়িতেছিল নিরো তখন বীণা বাজাইতেছিলেন। নিরোর পরবর্তী চারিজন সম্রাটের মধ্যে ভেস্‌পাসিয়ান, ডায়োক্লেসিয়ান ও কনষ্টানটাইনের নামই উল্লেখযোগ্য।

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই সুবিশাল রোমান সাম্রাজ্যের অধঃপতন শুরু হইয়াছিল। অতঃপর পঞ্চম শতাব্দীতে বর্বর (বিদেশী) জাতির আক্রমণের ফলে রোমান সাম্রাজ্য নামেমাত্র

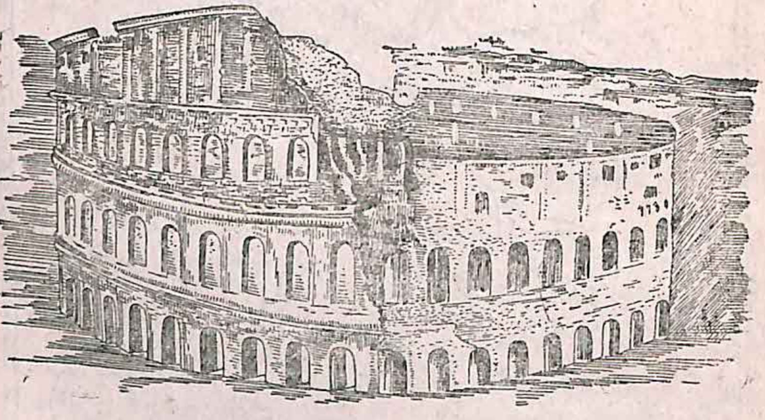
পর্যবসিত হইল। পরিশেষে বর্বরজাতির নেতা শেষ রোমান সম্রাট রোমিউলাস্ অগাস্টাসকে সিংহাসনচ্যুত করিলে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিল (৪৭৬ খ্রীঃ)।



রোমান সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য : রোমে ধনসম্পদের অন্ত ছিল না। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ হইতে নানাবিধ সামগ্রী রোমে আসিয়া

উপস্থিত হইত। রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল ইন্দ্রপুরীর মত সুন্দর ও ঐশ্বর্যময়। সাধারণের ব্যবহারের জন্য খুব বড় বড় অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছিল। এছাড়া রোমান সম্রাটগণ বহুসংখ্যক সাধারণের স্নানাগার, মন্দির, বিজয়তোরণ ও বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

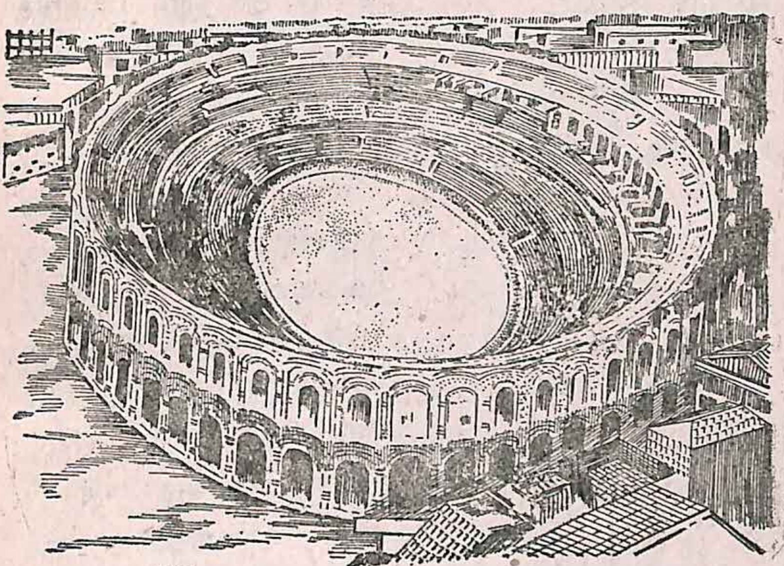
আমোদ-প্রমোদ : রোমের জনসাধারণের আনন্দ বিধানের জন্য নানারূপ খেলাধূলার বন্দোবস্ত ছিল। রোমান সার্কাসে ঘোড়দৌড় ও রথের দৌড় অনুষ্ঠিত হইত, তবে প্রাচীন রোমে সবচেয়ে



কলোসিয়াম

আকর্ষণীয় ছিল বন্যজন্তু ও মল্লবীরদের লড়াই। এইজন্যই রোম নগরীতে নির্মিত হইয়াছিল এক বিস্ময়কর কলোসিয়াম। আর ইহারই অনুকরণে সাম্রাজ্যের উপনিবেশগুলির নগরে নগরে ক্রীড়াঙ্গন তৈয়ারি হইয়াছিল। সেগুলিকে বলা হইত অ্যাম্ফিথিয়েটার। এই সকল উপবৃত্তাকার অট্টালিকার ছাদগুলি ছিল উন্মুক্ত, মধ্যস্থলে খেলা দেখাইবার জন্য স্থান। সেখানে ক্রীতদাস ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামীদিগকে কুস্তি শিক্ষা দিয়া লড়াই-এর জন্য মল্লবীর (গ্ল্যাডিয়েটর) তৈয়ারি করা হইত। তাহারা নিজেদের মধ্যে

লড়াই করিত এবং অনেকে বন্যজন্তুর সঙ্গেও লড়িত। বস্তুত ইহা ছিল এক নিষ্ঠুর খেলা। কিন্তু লোকেরা এইসব ভয়ঙ্কর লড়াই দেখিয়া পৈশাচিক আনন্দে উন্মত্ত হইত।



অ্যাম্ফিথিয়েটার

যীশুখ্রীষ্টের কাহিনী ঃ প্রথম রোমান সম্রাট্ অগাস্টাসের রাজত্বকালে জুডিয়া দেশে খ্রীষ্টধর্মের প্রবর্তক যীশুখ্রীষ্টের জন্ম হয়। জুডিয়া দেশ ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত প্রাচীন প্যালেস্টাইন রাজ্যের একটি অংশ। ইহুদী জাতিরা এখানে বাস করিত। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের সময়ে ইহা রোমান সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ ছিল।

যীশুর জীবনী ঃ যীশুর মাতার নাম মেরী। যোসেফ নামে এক ছুতার মিস্ত্রীর সহিত মেরীর বিবাহ হইয়াছিল।

সেকালে জুডিয়া দেশে বহু ধর্মপ্রচারক ছিলেন। যীশু অল্প বয়স হইতে ভগবান ও ধর্ম সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ত্রিশ বৎসর বয়সে যীশু তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা জনের নিকট জর্ডান নদীর

পবিত্র জলে অভিষিক্ত হন। অতঃপর তিনি জনের দ্বারা প্রভাবিত হন এবং শীঘ্রই তিনি তাঁহার ধর্মমত প্রচার করেন। তাঁহার শিষ্যরা তাঁহাকে খ্রীষ্ট নামে অভিহিত করেন এবং তাঁহার ধর্ম খ্রীষ্টধর্ম নামে পরিচিত।



যীশুখ্রীষ্ট

যীশুর নূতন ধর্ম ঃ যীশু বলিতেন, "স্বর্গরাজ্য আসিতে আর দেরী নাই। ভগবানের পুত্র মানুষের ত্রাণকর্তা আসিতেছেন। যাহারা ভগবানকে ভালবাসিবে এবং তাঁহার প্রেরিত ত্রাণকর্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবে, তাহারা স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হইবে। সকল মানুষই ভগবানের সন্তান, সুতরাং পরস্পরকে ভাই-এর মত ভালবাসিতে হইবে।"

যীশু বড়লোককে বাদ দিয়া গরীব-দুঃখীদের মধ্যে তাঁহার মত প্রচার করিতেন। যীশুর নিকট আশার বাণী শুনিয়া হতাশ ও নিপীড়িতের দল তাঁহার শিষ্য হইতে লাগিল। এই সময়ে তিনি অলৌকিক শক্তি দেখাইতেন। তাঁহার স্পর্শে দুর্বল সবল হইত, পীড়িত সুস্থ হইয়া উঠিত।

মৃত্যু ঃ শেষে যীশু প্রচার করিলেন যে, তিনিই ত্রাণকর্তা, তিনি ভগবানের সন্তান, তিনিই পৃথিবীতে নূতন স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিবেন। ইহুদীরা বহুদিন হইতে বিশ্বাস করিত যে, পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপনের জন্য একজন ত্রাণকর্তা আসিবেন। যীশু নিজেকে

সেই ত্রাণকর্তা বলিয়া ঘোষণা করায় জুডিয়ার প্রধান পুরোহিত প্রধান প্রধান নেতাদের লইয়া একটি সভা আহ্বান করিলেন। তাঁহারা যীশুকে গ্রেপ্তার করিয়া রোমান শাসনকর্তার সম্মুখে হাজির করিলেন। বিচারে যীশুর মৃত্যুদণ্ড হইল। তাঁহাকে একটা কাঠের ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া মারা হইল।

খ্রীষ্টধর্মের প্রসার : যীশুর মৃত্যু হইলেও খ্রীষ্টধর্মের প্রসার রুদ্ধ হইল না, বরং বাড়িয়া গেল। ক্রমে খ্রীষ্টধর্ম রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু তখন খ্রীষ্টানদের উপর খুবই অত্যাচার করা হইত এবং এমন কি তাহাদের হিংস্র জীবজন্তুর সামনে ফেলিয়া দিয়া নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হইত। তাহা সত্ত্বেও খ্রীষ্টধর্মের প্রসার ক্ষুণ্ণ হয় নাই এবং পরিশেষে রোমান সম্রাট কনস্টানটাইন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিলে ইহা রোম সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা পাইল।

অনুশীলনী

১। জুলিয়াস সীজারের উত্থান ও পতন সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

২। অগাস্টাস কে ছিলেন ? তাঁহার শাসনকালের গুরুত্ব আলোচনা কর।

৩। রোম সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য ও রোমের লোকদের আমোদ-প্রমোদ সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন :

১। সীজারকে কি কারণে হত্যা করা হইয়াছিল ?

২। অক্টেভিয়ান কি রোমের সম্রাট ছিলেন ? তাঁহার আমলে কোন্ মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছিল ?

৩। অ্যাম্ফিথিয়েটার ও কলোসিয়াম বলিতে কি বুঝ ?

৪। কোন্ রাজার রাজত্বকালে রোমে অগ্নিকাণ্ড হইয়াছিল ?

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। সীজার দুইবার — আক্রমণ করেন এবং পরিশেষে — জয় করেন।

২। রোমের সেনেট অক্টেভিয়ানকে — উপাধিতে ভূষিত করেন।

৩। যীশুকে শিষ্যরা — নামে অভিহিত করিতেন এবং তাঁহার প্রবর্তিত ধর্ম — নামে পরিচিত।

পঞ্চদশ অধ্যায়

চীন সভ্যতার অগ্রগতি

শাং বংশঃ খ্রীষ্টপূর্ব ১৫৫৪ অব্দে চীনে শাং বংশের রাজত্বকালের সূচনা হইয়াছিল। এই রাজাদের আমলে চীন বলিয়া যে সকল এলাকার বর্ণনা আছে তাহা হোয়াং-হো উপত্যকার মধ্যবর্তী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। শাং বংশের রাজত্বকালে দুইটি ক্ষেত্রে চীনের অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, চীনে এই সময় ব্রোঞ্জ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, এই প্রথম চীন উপনিবেশ স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিল।



কাছিমের খোলার উপরে দৈববাণী

শাং রাজাদের রাজধানী ধ্বংস হইয়াছিল এবং মাটির নীচে চাপা পড়িয়াছিল। এই স্থানটি 'ইনদের ঢিপি' নামে পরিচিত, কারণ শাং বংশ ইন বংশ নামেও পরিচিত ছিল। এই স্থান এখন মাটি খুঁড়িয়া বাহির করা হইয়াছে। শাং রাজাদের কীর্তি-কাহিনী সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না। তবে মাটি খুঁড়িয়া যে সকল ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে আমরা এই যুগের চীনাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারি। এখানে ব্রোঞ্জ-নির্মিত অস্ত্রশস্ত্র, এনামেল-করা পাত্র এবং মাটির অনেক বাসনপত্র পাওয়া গিয়াছে। এই সকল পাত্রের উপর নানারূপ কারুকার্য আছে। কাছিমের খোলার উপর দৈববাণী লেখা আছে, এই সকল দৈববাণীর মধ্যে অনেক রাজার নাম পাওয়া যায়। যে ছবি আঁকা আছে তাহার

মধ্যে তীর ও বর্শা লইয়া শিকারের ছবি এবং কুকুর, শূকর ও ষাঁড় প্রভৃতি জন্তুর ছবি আছে।

শাং রাজবংশের শেষের দিকের রাজাদের নৈতিক অধঃপতন দেখা দিলে দেশবাসী তাহাদের আর পছন্দ করিত না। এই অবস্থায় চীনের



শাং যুগের পাত্র

পশ্চিমাঞ্চলের চৌ জাতির নেতা ওয়েন ওয়ু শাং রাজত্বের অবসান ঘটাইয়া নিজে রাজা হইয়া বসিলেন।

চৌ বংশ দুই শত বৎসর ধরিয়া রাজত্ব করে। খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী হইতেই চৌ রাজাদের ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। অতঃপর চীন ক্রমশ অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই সকল রাজ্যের রাজারা প্রায়ই পরস্পর যুদ্ধ করিতেন। উত্তর হইতে বর্বর জাতিরা আসিয়া দেশ আক্রমণ করিত। এই বিশৃঙ্খলার যুগেই চীনে চিরস্মরণীয় ধর্মগুরু ও দার্শনিক কনফিউশিয়াস্ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

কনফিউশিয়াস্ঃ ভারতে যে-সময়ে বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্ম প্রচার করেন সেই সময়ে চীনে কনফিউশিয়াস্ জন্মগ্রহণ করেন ও তাঁহার মত

প্রচার করেন। সে-সময়ে চীনদেশে লু নামে একটি রাজ্য ছিল, এখন ইহার নাম সানতুং। এই লুরাজ্যে কনফিউশিয়াসের জন্ম হয় (খ্রীঃ পূঃ ৫৫১ অব্দ)। দুঃখকষ্ট দেখিয়া বুদ্ধদেব যেমন সেই দুঃখকষ্ট হইতে উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিয়াছিলেন, সেইরূপ দেশের দুর্দশা দেখিয়া কনফিউশিয়াস্ সেই দুর্দশা কিভাবে দূর করা যায় তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।



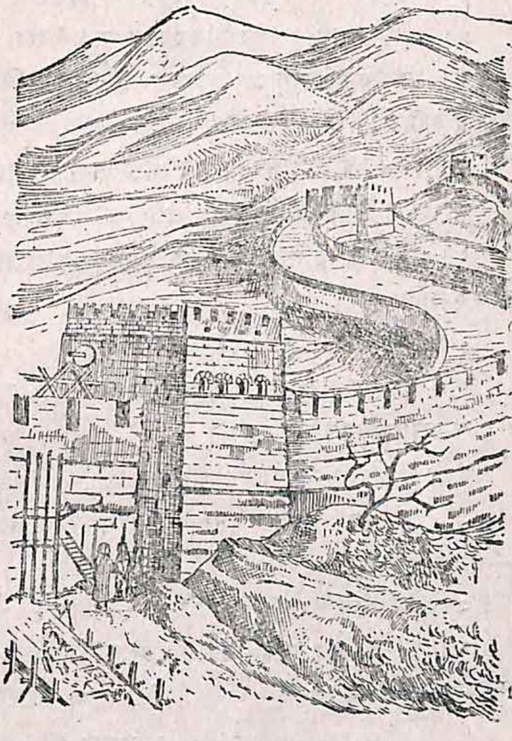
কনফিউশিয়াস্

কনফিউশিয়াসের পারিবারিক নাম ছিল খুঙ্। নিজের চেষ্টাতেই তিনি শিক্ষা লাভ করেন। আবাল্য দারিদ্র্যের সহিত পরিচিত কনফিউশিয়াস্ মনে করিতেন সমাজ ও শাসনব্যবস্থার ত্রুটিই ব্যক্তিজীবনের দুঃখকষ্টের হেতু।

শিক্ষাদানঃ কনফিউশিয়াস্ বাইশ বৎসর বয়সে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তিনি শিক্ষা দিতেন কথোপকথন ছলে। ছাত্রের অন্তরে নীতিবোধ জাগাইয়া তাহাকে মানুষ করিয়া তোলাই ছিল কনফিউশিয়াসের লক্ষ্য।

ক্রমে কনফিউশিয়াস্ একটি শহরের প্রধান শাসনকর্তা হন। সেখানে তিনি মানুষের আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য কতকগুলি আইন প্রণয়ন করেন। জীবনের সমস্ত রকম কাজের জন্যই আইন করা হইয়াছিল। এমন কি, বিভিন্ন শ্রেণীর লোকে কে কি খাইবে তাহার জন্যও আইন হইয়াছিল। শেষ বয়সে কনফিউশিয়াস্ এ-পদ ছাড়িয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া তাঁহার নীতি প্রচার করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি লুরাজ্যে ফিরিয়া আসেন এবং সেখানে কিছুকাল পরে তাঁহার মৃত্যু হয় (খ্রীঃ পূঃ ৪৭৯ অব্দ)।

ধর্মমতঃ কনফিউশিয়াস্ বলিতেন যে, মানুষকে সংসার ছাড়িতে হইবে না, সংসারে থাকিয়াই সমাজের উন্নয়নে মনোযোগ দিতে হইবে। তাহা হইলে দুঃখকষ্টের কারণ দূর হইবে। ইহার জন্য মানুষকে কয়েকটি ভাল নিয়ম পালন করিয়া মহৎ জীবন যাপন করিতে হইবে। শাসককে সামাজিক পদ্ধতি ও নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিতে হইবে। তিনি নিজের কর্তব্য করিলে তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া সকলে আপন আপন পথে ভালভাবে চলিবে। কনফিউশিয়াসের মতে সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি মানিয়া চলাই ধর্ম।



চীনের বিখ্যাত প্রাচীর

ছিন্ বংশ—চীনের প্রথম সাম্রাজ্যঃ খ্রীষ্টপূর্ব ২২১ অব্দে চীনে ছিন্ বংশের রাজত্বকালের সূচনা হয়। এই বংশের রাজত্বকালে (খ্রীঃ পূঃ ২২১—২০৭ অব্দ) চীনে প্রথম অখণ্ড সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশের সম্রাটগণ নামের আগে একটি 'ছিন্' শব্দ ব্যবহার করিতেন এবং এই রাজবংশের নামেই চীনদেশ অভিহিত।

ছিন্ বংশের প্রথম সম্রাট শির-হুয়াং-তি চীনের বিখ্যাত প্রাচীর নির্মাণ করিয়া ইতিহাসে অমর হইয়া আছেন। এই সময় যাযাবর

মঙ্গোলীয় জাতি প্রায়ই উত্তর সীমান্তে প্রবেশ করিয়া হাঙ্গামা ও উপদ্রব করিত। ইহা চিরদিনের জন্য বন্ধ করিবার জন্য চীনদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম ঘিরিয়া তিনি সুউচ্চ প্রাচীর নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

অনুশীলনী

১। চীনের শাং বংশের রাজত্বকাল সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

২। কনফিউশিয়াস্ কে ছিলেন? কিভাবে তিনি শিক্ষাদান করিতেন? তাঁহার ধর্মমত কি ছিল?

৩। কোন্ রাজবংশের আমলে চীনে প্রথম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন:

১। 'ইনদের ঢিপি' বলিতে কি বুঝ? শাং বংশের পর চীনে কোন্ রাজবংশ রাজত্ব করিত?

২। কনফিউশিয়াসের ধর্মমত কি ছিল?

৩। কাহার রাজত্বকালে চীনের বিখ্যাত প্রাচীর নির্মিত হইয়াছিল?

শূন্যস্থান পূরণ কর:

১। শাং বংশ — নামেও পরিচিত।

২। ভারতে যে-সময়ে বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্মমত প্রচার করেন সেই সময়ে চীনে —জন্মগ্রহণ করেন।

৩। কনফিউশিয়াস্ শিক্ষা দিতেন — ছলে।

৪। — বংশের প্রথম সম্রাট — চীনের বিখ্যাত — নির্মাণ করিয়া ইতিহাসে অমর হইয়া আছেন।

———

ষোড়শ অধ্যায়

প্রাচীন ভারত

বৈদিক যুগে আর্য সভ্যতা : সংস্কৃত, ইরানীয়, ল্যাটিন, গ্রীক প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার মধ্যে অনেক মিল দেখা যায়। এই মিল দেখিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, প্রাচীন আদি ভাষা হইতে এই ভাষাগুলির উৎপত্তি হইয়াছে। অতি-প্রাচীনকালে এক প্রাচীন জাতি এই ভাষায় কথা বলিত। সেই প্রাচীন জাতি আর্য নামে পরিচিত।

আর্যদের আদি বাসভূমি : কোথায় এই আর্যজাতি প্রথমে বাস করিত তাহা বলা যায় না। সম্ভবত মধ্য-এশিয়া ও মধ্য-ইউরোপ হইতে তাহারা আসিয়াছিল ; আবার কেহ কেহ বলেন, তাহারা উত্তর মেরু প্রদেশে বাস করিত। কালক্রমে তাহাদের একটি শাখা ভারতে প্রবেশ করে। অপর শাখাগুলি ইরান, গ্রীস ও ইউরোপের অন্যান্য অংশে প্রবেশ করিয়াছিল। ভারতে যে-শাখা প্রবেশ করে, তাহারা পাঞ্জাবে বসতি স্থাপন করিয়াছিল এবং তথাকার আধিবাসীদিগকে পরাস্ত করিয়া নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

বৈদিক সাহিত্য : ভারতীয় আর্যদের মধ্যে সর্বপেক্ষা প্রাচীন সাহিত্যের নাম বেদ। বেদ চারিটি—ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ। ঋগ্বেদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহাতে এক হাজারের বেশী স্তোত্র আছে।

হিন্দুরা বলেন, বেদ মানুষের রচিত নহে, ঈশ্বরের বাণী। ঋষিরা ধ্যানযোগে এই বাণী শুনিতেন বলিয়া ইহার আর এক নাম 'শ্রুতি'।

সমগ্র বেদ এককালে রচিত হয় নাই, বহুকাল ধরিয়া রচিত হইয়াছিল। সুতরাং ইহা স্বাভাবিক যে, বৈদিক সাহিত্য বিবিধ ও বিভিন্ন প্রকার। বৈদিক সাহিত্য সাধারণত চারিভাগে বিভক্ত। যথা—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ।

সামাজিক জীবন ঃ আর্য সমাজ ছিল পরিবার-কেন্দ্রিক। এক এক পরিবার একসঙ্গে বাস করিত এবং পরিবারস্থ সকলেই গৃহপতির শাসন মানিয়া চলিত। গৃহস্থের পক্ষে বিবাহ বাধ্যতামূলক ছিল এবং পুরুষের বহু বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না।

সমাজে স্ত্রীলোকদের বিশেষ সম্মান ছিল। বিবাহিতারা স্বামীর সহধর্মিণীরূপে প্রত্যেক ক্রিয়া-কলাপেই যোগদান করিতেন। ইহা ছাড়া গৃহের বাহিরেও তাঁহারা পুরুষের সহকর্মিণী ছিলেন। স্ত্রীলোকেরা অনেক বয়স পর্যন্ত বিবাহ না করিয়া লেখাপড়া শিখিতে পারিতেন এবং কেহ কেহ বেদের মন্ত্র পর্যন্ত রচনা করিতেন। গার্গী, মৈত্রেয়ী, অপালা প্রভৃতি মহিলা ঋষিগণ বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।

বর্ণ-বিভাগ—চারিবর্ণ

প্রথমে আর্য সমাজে বর্ণবিভাগ বা জাতিভেদ তত কঠোর ছিল না। ঋগ্বেদে ব্রাহ্মণ, রাজন্য, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারি বর্ণের উল্লেখ আছে, কিন্তু তখন অন্য বর্ণের সহিত বিবাহ প্রচলিত ছিল। কেহ ইচ্ছা করিলে নিজ বর্ণের নির্দিষ্ট বৃত্তি ত্যাগ করিয়া অন্য বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারিত। আর্যগণ গৌরবর্ণ ছিল। তাহারা কৃষ্ণবর্ণ আদিম অধিবাসীদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত। এইরূপে বিজেতা আর্য ও বিজিত অনার্য এই দুই শ্রেণীর সৃষ্টি হইল। এইরূপ বর্ণভেদ ছাড়া আর কোনরূপ জাতিভেদ ছিল বলিয়া মনে হয় না। ক্রমে সমাজে জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তি ও কর্ম অনুসারে জাতিভেদের কঠোরতা দেখা দিল। যাঁহারা শাস্ত্রাদিতে পারদর্শী ও যাগ-যজ্ঞে দক্ষ হইয়া উঠিলেন, তাঁহারা

হইলেন ব্রাহ্মণ। যাঁহারা যুদ্ধবৃত্তি অবলম্বন করিলেন এবং দেশ শাসনে দক্ষতার পরিচয় দিলেন, তাঁহারা হইলেন রাজন্য বা ক্ষত্রিয়। যাঁহারা কৃষি ও ব্যবসায় বৃত্তি অবলম্বন করিলেন, তাঁহারা হইলেন বৈশ্য। আর যাহারা সমাজে এই তিন বর্ণের সেবা করিত, তাহারা হইল শূদ্র।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের জীবন চারিটি আশ্রমে বা স্তরে বিভক্ত ছিল। বাল্যকালে সকলকেই শিক্ষার জন্য গুরুগৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। গুরুগৃহে বাস করিয়া সকলে অধ্যয়ন করিত এবং গুরুর নানা কাজ করিয়া দিত। এই জীবনকে ব্রহ্মচর্য আশ্রম বলা হইত। দ্বিতীয় আশ্রম গার্হস্থ্য—শিক্ষা শেষ করিয়া শিষ্য গৃহে ফিরিতেন এবং বিবাহ করিয়া সংসারী বা গৃহস্থ হইতেন। তৃতীয় আশ্রম বানপ্রস্থ—সংসার জীবন শেষ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে গৃহস্থ গৃহ ছাড়িয়া পত্নীর সহিত তপস্যা করিবার জন্য বনে যাইতেন। আবার কখনও কখনও তিনি একাই বনে গমন করিতেন।

চারি আশ্রম

চতুর্থ আশ্রম সন্ন্যাস—বহুদিন তপস্যা করিবার পর সন্ন্যাসী (যতি বা ভিক্ষু) হইতেন, তখন তিনি সংসারের সকল মায়া ও বন্ধন ছিন্ন করিয়া একাকী সন্ন্যাসীর ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং ঈশ্বরচিন্তায় সময় কাটাইতেন।

বৈদিক যুগের ধর্ম : বেদ হইতে আর্যদের ধর্ম ও দেবতাদের কথা জানা যায়। প্রথম অবস্থায় বৈদিক ধর্ম ছিল সহজ, সরল, অনাড়ম্বর। তাহারা সূর্য, বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতা বলিয়া পূজা করিত। দেবতাদিগের মধ্যে প্রধান ছিলেন ইন্দ্র ও বরুণ। ইন্দ্র ছিলেন বৃষ্টি ও বজ্রের দেবতা ; বরুণ ছিলেন আকাশ ও সমুদ্রের দেবতা। কালক্রমে বরুণের প্রাধান্য কমিয়া গেল এবং ইন্দ্রই প্রধান হইলেন। ঋগ্বেদে সরস্বতী, ধরিত্রী, উষা প্রভৃতি স্ত্রী-দেবতার উল্লেখ আছে।

আর্যদের ধর্ম গতিশীল ছিল না মনে করা ভুল হইবে। ঋগ্বেদের

দশম মণ্ডলের "হে অগ্নি তুমিই মিত্র, তুমিই বরুণ" ইত্যাদি স্তুতি হইতে প্রমাণিত হয় যে, আর্য ঋষিগণ বহু দেবতাকে এক বলিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে তাহারা বুঝিতে পারিল যে, সমগ্র জগৎ এক এবং এক শ্রেষ্ঠ দেবতা এই বিশ্ব সৃজন ও নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। তাহারা সেই শ্রেষ্ঠ দেবতাকে প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ভ বা বিশ্বকর্মা নামে অভিহিত করিত।

রাজনৈতিক জীবন ঃ বৈদিক যুগে রাজা রাজ্যের সর্বময় কর্তা ছিলেন। রাজপদ সাধারণত বংশানুক্রমিক ছিল। কখনও কখনও তাঁহারা নির্বাচিত হইতেন এইরূপ উল্লেখও আছে। দেশরক্ষা ও শাসন পরিচালনা রাজার প্রধান কর্তব্য ছিল। রাজাকে পরামর্শ দিবার জন্য সভা ও সমিতি নামে জনগণের প্রতিষ্ঠান ছিল। রাজতন্ত্র ব্যতীত বৈদিক যুগে কোথাও কোথাও গণতন্ত্রও প্রচলিত ছিল।

মহাকাব্য ঃ রামায়ণ ও মহাভারত এই দুইখানি হিন্দুদের প্রাচীন মহাকাব্য।

বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের পরিচয় বাল্মীকি ও ব্যাস রচিত এই দুইটি মহাকাব্য হইতে বিশেষভাবে জানিতে পারা যায়। মহাভারতের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদগীতা হিন্দুকে নিষ্কাম কর্মযোগ শিক্ষা দিয়াছে। এই দুই মহাকাব্যে কয়েকটি আদর্শ চরিত্র নিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে। মহাভারত ও রামায়ণের রাজনীতি প্রধানত ধর্মনীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ ও রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্র হিন্দুদের নিকট পূর্ণব্রহ্ম ভগবানরূপে পূজিত। এই দুইখানি মহাকাব্য হিন্দুদের নিকট ধর্মনীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতি শিক্ষা দিয়াছে। পারিবারিক জীবনের আদর্শ আলেখ্য হিন্দুর সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছে। সীতার পাতিব্রত্য, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম, যুধিষ্ঠিরের ধর্মনিষ্ঠা, ভীষ্মের পিতৃভক্তি বহু শতাব্দী যাবৎ হিন্দুর কর্মজীবন ও ধর্মজীবন নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

মহাবীর বুদ্ধদেবের জীবনী ও বাণী

সূচনা ঃ যে-সময়ে বেদ রচিত হয় সেই সময়ে আর্যদের ধর্ম বেশ সরল ছিল। ইহার অনেক পরে বৈদিক ধর্ম যাগ-যজ্ঞ ও অনুষ্ঠানের ঘটায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। ধর্ম এত জটিল হইয়া পড়িল যে, সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা পালন করা কঠিন হইল। সকলে এই ধর্মে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। অনেকে প্রচলিত বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া এক সহজ, সরল ধর্ম প্রচার করিতে মন দিলেন। এই সকল ধর্মপ্রচারকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিলেন মহাবীর ও বুদ্ধদেব। ইহারা উভয়েই প্রথম জীবনে ক্ষত্রিয় রাজকুমার ছিলেন।

বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের জটিলতা

মহাবীর ঃ মহাবীরের পূর্বেই জৈনধর্ম প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং এই ধর্মের মোট চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর (ধর্মপ্রবর্তক)-এর মধ্যে মহাবীরের ঠিক পূর্ববর্তী তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার উপদেশসমূহ চতুর্যাম নামে পরিচিত, যথা—অহিংসা, সত্য-বাদিতা, অচৌর্য (চুরি না-করা) ও অপরিগ্রহ (স্বেচ্ছায় না দিলে কোন দান গ্রহণ না-করা)।



মহাবীর

মহাবীরের আগেকার নাম বর্ধমান। ত্রিশ বৎসর বয়সে সংসার ছাড়িয়া তিনি সন্ন্যাসী হন। তারপর বার বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। তখন হইতে তাঁহার নাম হয় মহাবীর। সমস্ত ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার আর এক নাম 'জিন'। এইজন্য তাঁহার শিষ্যগণকে জৈন বলা হয়। তাঁহার ধর্মের সার কথা এই যে,

কোন জীবজন্তুর হিংসা করা চলিবে না, সত্য কথা বলিতে হইবে এবং সৎ ও পবিত্র জীবন যাপন করিতে হইবে। মহাবীর ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তাঁহার ধর্ম প্রচার করিয়া নানা-দেশ ঘুরিলেন এবং ৭২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন (৪৭৮ খ্রীঃ পূর্বাব্দ)।

ধর্মমত

বুদ্ধদেব ঃ বুদ্ধদেব প্রথম জীবনে সিদ্ধার্থ গৌতম নামে পরিচিত ছিলেন। হিমালয়ের পাদদেশে নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলবাস্তু নামে এক নগর ছিল। সেখানে শাক্য নামে এক ক্ষত্রিয় জাতি বাস করিত। শাক্যবংশীয় রাজা শুদ্ধোদন সেখানে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পুত্রের নাম সিদ্ধার্থ গৌতম। বাল্যকাল হইতে সংসারের দুঃখকষ্ট দেখিয়া গৌতমের মনে বড় আঘাত লাগিত এবং কিসে এই দুঃখকষ্ট দূর হয়, সে-বিষয়ে তিনি সর্বদা চিন্তা করিতেন। পুত্রের এই মনোভাব বুঝিতে পারিয়া রাজা শুদ্ধোদন চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। যাহাতে সংসারে পুত্রের মন বসে সেইজন্য তিনি অল্প বয়সে গৌতমের বিবাহ দিলেন। কিন্তু তাহাতেও গৌতমের মন ফিরিল না।



বুদ্ধদেব

এই সময়ে গৌতমের এক পুত্র জন্মিল। সংসারের বন্ধন ক্রমেই বাড়িতেছে দেখিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। একদিন গভীর রাত্রে গৃহ ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স ছিল ২৯ বৎসর। গৌতম প্রথমে বৈশালীর মঠে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তারপর তিনি গয়ার নিকটে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে উরুবিল্ব গ্রামে ছয় বৎসর কঠোর তপস্যা করিলেন, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধান পাইলেন

না। তখন তপস্যা ছাড়িয়া গ্রামে ভিক্ষা করিতে গেলেন। তাঁহার সঙ্গে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁহারা তাঁহার বিফলতা দেখিয়া বারাণসীর নিকটে মৃগদাবে পলাইয়া গেলেন।

সেদিন বৈশাখী পূর্ণিমা। নৈরঞ্জনা নদীর দিকে যাইতে যাইতে তিনি সুজাতা নামক একটি গ্রাম্য রমণীর হাত হইতে একপাত্র পায়স গ্রহণ করিলেন। তারপর নৈরঞ্জনা নদীতে স্নান করিয়া সেই পায়স আহার করিলেন। দিনের বাকী সময়টা তিনি এক রমণীয় উদ্যানে কাটাইলেন এবং সন্ধ্যার সময় এক বৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। এই বৃক্ষের মূলে বসিয়া তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন এবং এইখানেই তাঁহার প্রকৃত জ্ঞানের উন্মেষ হইল। যে-দ্রুমের বা গাছের তলায় বসিয়া তিনি বোধি বা দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন সেই গাছের নাম হইল বোধিদ্রুম। আর সেই স্থানের নাম হইল বুদ্ধগয়া। সিদ্ধার্থ গৌতমের নাম হইল বুদ্ধ বা জ্ঞানী।

দিব্যজ্ঞান লাভ

দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধদেব এই জ্ঞান প্রচার করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু এই সত্য সহজে কে বুঝিবে? যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ তপস্যাকালে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন প্রথমে বুদ্ধদেব তাঁহাদের কথা ভাবিলেন। মৃগদাবে গিয়া এই পাঁচজন ব্রাহ্মণের নিকট তিনি সর্বপ্রথম তাঁহার ধর্মমত প্রচার করিলেন।

বুদ্ধের ধর্মমত—চারিটি মহাসত্য বা আর্যসত্য বৌদ্ধধর্মমতের মূল ভিত্তি, যথা—(১) জগতে দুঃখকষ্ট আছে, (২) দুঃখকষ্টের কারণ আছে এবং তাহা হইল আকাঙ্ক্ষা, (৩) দুঃখকষ্ট হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে, (৪) দুঃখকষ্ট অবসানের উপায় আছে, এজন্য সঠিক পথের সন্ধান করিতে হইবে। মানুষের আকাঙ্ক্ষা হইতেই দুঃখের উৎপত্তি হয়। দৃষ্টি ও সঙ্কল্প, বাক্য ও কর্ম, জীবিকা ও চেষ্টা, স্মৃতি ও সমাধি—এই আটটি বিষয়ে ভাল হইলে আকাঙ্ক্ষার অবসান হইবে। ইহাই বুদ্ধ প্রবর্তিত অষ্টাঙ্গিক মার্গ। লোভ ও আকাঙ্ক্ষা হইতে মুক্তি পাইবার নাম নির্বাণ। নির্বাণ লাভ করিলে জীবনের সমস্ত দুঃখকষ্টের অবসান হয়।

ধর্মপ্রচার ঃ বুদ্ধদেব বিহার ও উত্তরপ্রদেশের রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, বৈশালী, কপিলবাস্তু প্রভৃতি নগরে ধর্মপ্রচার করিয়া বেড়াইলেন। রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন সকল শ্রেণীর লোকই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিল। মগধের রাজা বিম্বিসার, কোশলের ধনী বণিক অনাথপিণ্ড এবং রাজগৃহের সারিপুত্ত ও মোগ্গলন তাঁহার শিষ্য হইলেন। দরিদ্র আনন্দ ও নাপিত উপালি সংসার ছাড়িয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। এইভাবে নানাস্থানে ধর্মপ্রচার করিয়া বুদ্ধদেব ৮০ বৎসর বয়সে উত্তরপ্রদেশের কুশীনগরে দেহত্যাগ করিলেন (৪৮৬ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ)।

বৌদ্ধসঙ্ঘ ঃ বুদ্ধদেব বারাণসীর মৃগদাবে তাঁহার পঞ্চ শিষ্যের নিকট প্রথম প্রচারকার্য আরম্ভ করেন এবং এই পাঁচজন শিষ্যকে লইয়া তিনি প্রথম বৌদ্ধসঙ্ঘ গঠন করেন। বৌদ্ধসঙ্ঘ ক্রমশ বিস্তারলাভ করিতে থাকে এবং শেষে বিশাল আকার ধারণ করে।

ত্রিপিটক—বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্মমত লিখিয়া যান নাই। তিনি মুখে মুখে শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্যেরা রাজগৃহে মিলিত হইয়া তাঁহার ধর্মমত তিনটি পুস্তকে সঙ্কলিত করেন। এই তিনটি পুস্তকের নাম ত্রিপিটক—(১) বুদ্ধদেব স্বয়ং যে-শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন তাহার নাম সূত্র, (২) বৌদ্ধমঠবাসীদিগের নিয়মাবলীর নাম বিনয় এবং (৩) বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক আলোচনাসমূহের নাম অভিধর্ম। পরবর্তী কালে বুদ্ধদেবের পূর্ব-জীবনের কাহিনীগুলি লেখা হইয়াছিল, ইহাকে বলে জাতক।

সাম্রাজ্যের পথে ভারত

সূচনা ঃ বুদ্ধদেব যখন তাঁহার ধর্ম প্রচার করিতেছিলেন তখন মগধে বিম্বিসার নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। বর্তমান বিহার প্রদেশের দক্ষিণভাগে মগধ রাজ্য অবস্থিত ছিল। ক্রমে বিম্বিসারের বংশধরগণ দুর্বল হইয়া পড়িলে মগধে শিশুনাগ বংশের উত্থান হয়।

নন্দবংশ ঃ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মহাপদ্ম নন্দ বা উগ্রসেন মগধ-সিংহাসন অধিকার করিয়া নন্দবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। মহাপদ্ম জাতিতে শূদ্র ছিলেন। তিনি সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজার উচ্ছেদ সাধন করিয়া একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি সম্ভবত আঠাশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তারপর তাঁহার আটটি পুত্র ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেন। আলেকজাণ্ডার যখন পাঞ্জাব আক্রমণ করেন, তখন নন্দবংশের শেষ রাজা ধননন্দ মগধে রাজত্ব করিতেন।

মৌর্য সাম্রাজ্য—চন্দ্রগুপ্ত (৩২২—২৯৮ খ্রীঃ পূঃ) ঃ আলেকজাণ্ডার যখন পাঞ্জাব আক্রমণ করেন, সেই সময়ে মগধ দরবার হইতে নির্বাসিত চন্দ্রগুপ্ত নামক এক বীরপুরুষ দিগ্‌বিজয়ী গ্রীকবরের শিবিরে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মগধরাজ্য আক্রমণ করিতে পরামর্শ দেন। কিন্তু আলেকজাণ্ডার মগধরাজ্য আক্রমণ না করিয়াই পাঞ্জাব হইতে চলিয়া গেলেন। পথে ব্যাবিলন নগরে খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৩ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

এই মৃত্যুসংবাদ পাঞ্জাবে পৌঁছিলে চন্দ্রগুপ্ত সেখানকার গ্রীক সেনাপতিদিগকে পরাস্ত করিয়া পাঞ্জাবে গ্রীক-আধিপত্য ধ্বংস করিলেন। তারপর তিনি কৌটিল্য বা চাণক্য নামক তক্ষশিলার এক সুচতুর ব্রাহ্মণের সাহায্যে নন্দবংশের উচ্ছেদসাধন করিয়া খ্রীষ্টপূর্ব ৩২১ অব্দে মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন।

প্রবাদ আছে, চন্দ্রগুপ্তের মাতা মুরা নন্দবংশের রাজার দাসী ছিলেন এবং এই মুরার নাম হইতেই চন্দ্রগুপ্তের বংশের নাম মৌর্যবংশ। কিন্তু বৌদ্ধদের মতে মৌর্যগণ মোরীয় নামক এক প্রাচীন ক্ষত্রিয়বংশ হইতে উদ্ভূত।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার লইয়া সেনাপতিদের মধ্যে কুড়ি বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। তারপর তাঁহারা এই সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া লইলেন। এশিয়াস্থিত সাম্রাজ্য সেলিউকাস নামক এক সেনাপতির ভাগে

পড়িল। সুতরাং পাঞ্জাবের যে-অংশ আলেকজাণ্ডার জয় করিয়াছিলেন তাহা পুনরুদ্ধার করিবার জন্য সেলিউকাস চন্দ্রগুপ্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন (খ্রীঃ পূঃ ৩০৪ অব্দ)। এই যুদ্ধের কোন বিশদ বিবরণ না



থাকিলেও সন্ধির শর্ত হইতে অনুমিত হয় যে, সেলিউকাসই পরাজিত হইয়াছিলেন। সেলিউকাস পাঞ্জাবের উপর তাঁহার সমস্ত দাবী ছাড়িয়া দিলেন, নিজ রাজ্য হইতে কাবুল, কান্দাহার, হিরাট ও

মাক্‌রাণ এই চারিটি প্রদেশ চন্দ্রগুপ্তকে দিলেন এবং ইহার পরিবর্তে তিনি পাঁচশত হস্তী পাইলেন।

অশোক (২৭৩—২৩২ খ্রীঃ পূঃ) ঃ চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বিন্দুসার মগধের রাজা হন। বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অশোক মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

অশোক মৌর্য সম্রাটগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। রাজ্যলাভের পর প্রথম কয়েক বৎসর অশোক তাঁহার পূর্বপুরুষদের মতই রাজ্যজয়ে মন দিলেন। প্রথমেই তিনি কলিঙ্গদেশ জয় করিতে গেলেন। কলিঙ্গের রাজাও স্বদেশ রক্ষার জন্য সৈন্যসামন্ত লইয়া বাধা দিলেন। উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হইল। অশোক জয়লাভ করিলেন বটে, কিন্তু যুদ্ধের নিদারুণ দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার মনে বড়ই আঘাত লাগিল।



অশোক

কলিঙ্গ জয়ের পরেই অশোকের মনে অনুশোচনা উপস্থিত হয়। তাই তিনি স্থির করিলেন যে, তিনি আর কখনও যুদ্ধ করিবেন না এবং শান্তির পথ অবলম্বন করিবেন।

বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা ও ধর্ম প্রচার ঃ ইহার পর অশোক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইলেন। বৌদ্ধ হইয়া অশোক ধর্ম প্রচারের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সাম্রাজ্যের মধ্যে ধর্মপ্রচারের নিমিত্ত অশোক বহু স্তূপ ও স্তম্ভ নির্মাণ করাইয়া তাহার গায়ে বুদ্ধের প্রকৃত ধর্মমত খোদিত করিয়া দিলেন। প্রকাশ্য স্থানে, পাহাড়ের গায়েও তিনি ধর্ম-উপদেশ খোদিত করিয়া দিয়াছিলেন। অশোকের শিলালিপিতে লেখা আছে, মাতাপিতা ও গুরুজনের প্রতি বাধ্যতা দেখাইতে হইবে, জীবের প্রতি দয়া দেখাইতে হইবে, সত্য কথা বলিতে হইবে।

ধর্মপ্রচারের জন্য অশোক সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলিতে প্রচারক পাঠাইতেন। ধর্মপ্রচারের জন্য যে-সব রাজকর্মচারী ছিলেন, তাঁহাদিগকে ধর্মমহামাত্র বলা হইত। ধর্মমহামাত্রগণ প্রজাদের নৈতিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট থাকিতেন। ধর্মপ্রচারের নিমিত্ত অশোক নিজেও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ প্রমোদের জন্য বিহার-যাত্রা করিতেন, তাহার পরিবর্তে অশোক ধর্মযাত্রা আরম্ভ করিলেন।

বিদেশে ধর্মপ্রচার

সাম্রাজ্যের বাহিরেও যাহাতে বৌদ্ধধর্মের প্রচার হয় তাহার জন্য অশোক প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। দক্ষিণের তামিল রাজ্যগুলিতে, সিংহলে, ব্রহ্মদেশে এবং পশ্চিম-এশিয়া, মিশর ও ইউরোপের গ্রীক রাজ্যগুলিতে বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারকগণ প্রেরিত হইয়াছিল। কথিত আছে, অশোকের পুত্র বা ভ্রাতা মহেন্দ্র এবং কন্যা বা ভগিনী সংঘমিত্রা সিংহলে ধর্মপ্রচার করিতে গিয়াছিলেন।

অশোক তাঁহার প্রজাদিগকে সন্তানের মত দেখিতেন। প্রজাগণ যাহাতে সুখে থাকে তাহার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতেন। মানুষ ও পশুর চিকিৎসার জন্য তিনি হাসপাতাল স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বড় বড় রাস্তা তৈয়ারি করিয়া তাঁহার পাশে বৃক্ষ রোপণ করিয়া ও কূপ কাটাইয়া দিয়াছিলেন। রাস্তার পাশে পথিকের বিশ্রামের জন্য সরাইখানা ছিল। আইনের কঠোরতা কমাইতেও তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন। কেবল নিজের প্রজাদের উন্নতির চেষ্টা করিয়াই

তিনি ক্ষান্ত হইতেন না। জগতের সকল মানবের যাহাতে উন্নতি হয় তাহার জন্য অশোক সচেষ্ট ছিলেন। তিনি শান্তির ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। জগতের কল্যাণের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন বলিয়া অশোক জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। অশোকের মৃত্যুর পর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

শ্রেষ্ঠত্ব

কুষাণ সাম্রাজ্য: মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর প্রথমে গ্রীক, শক ও পহ্লব এবং পরে কুষাণরা ভারতে প্রবেশ করেন। এই কুষাণগণ ইউচি নামক এক যাযাবর জাতির অন্তর্ভুক্ত। এক সময়ে ইউচি জাতি চীনদেশের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে বাস করিত। তাহারা নিজেদের দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া ব্যাকট্রিয়া দেশে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সেখানকার শকদিগকে তাড়াইয়া দিয়া ব্যাকট্রিয়া দেশ দখল করে। কালক্রমে তাহারা পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হইয়া হিন্দুকুশ পর্বতের উত্তরে পাঁচটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। এই পাঁচটি শাখার মধ্যে কুষাণ শাখা সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিল। কুষাণরাজ কুজল বা প্রথম কদ্‌ফিস্ অপর চারিটি শাখাকে পরাজিত করিয়া সমস্ত ইউচি জাতির একাধিপতি হন। তিনি কাবুল ও গান্ধার জয় করেন। তাঁহার রাজ্য পারস্যের পূর্বপ্রান্ত হইতে ঝিলাম নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রথম কদ্‌ফিসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বিম্ কদ্‌ফিস্ কুষাণ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ভারতের অভ্যন্তরে অনেক দূর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

কণিষ্ক: তৃতীয় কুষাণ-সম্রাট কণিষ্ক এই বংশের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত রাজা ছিলেন। কদ্‌ফিস্ রাজগণের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ ছিল তাহা জানা যায় না, তবে তিনি যে কুষাণবংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট, তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্যাকট্রিয়া দেশ এবং উহার উত্তর ও পূর্ব অঞ্চল এবং ভারতে কাবুল ও কাশ্মীর হইতে কাশী পর্যন্ত সমস্ত ভূ-ভাগ ব্যাপিয়া কণিষ্কের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পুরুষপুর বা

পেশোয়ার ছিল তাঁহার রাজধানী। তিনি পাটলিপুত্র ও পার্থিয়ার রাজাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন এবং চীন সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কণিষ্ক বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। প্রসিদ্ধ কবি ও দার্শনিক অশ্বঘোষ ও বসুমিত্র; দার্শনিক নাগার্জুন, আয়ুর্বেদগ্রন্থ-প্রণেতা চরক প্রভৃতি পণ্ডিত তাহার সভা অলঙ্কৃত করিতেন।


কণিষ্ক (মথুরায় প্রাপ্ত)

কণিষ্ক শেষ বয়সে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় মধ্য-এশিয়ায় ও চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম বিস্তৃত হয়। তিনি অনেকগুলি মঠ ও স্তূপ নির্মাণ করেন। রাজধানী পুরুষপুরে বুদ্ধের দেহাবশেষের উপর তিনি যে বিরাট চৈত্য নির্মাণ করিয়াছিলেন, সে-যুগে তাহা একটি দর্শনীয় বস্তু ছিল। বৌদ্ধগণের উত্তর ও দক্ষিণ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মতভেদ ছিল, তাহার মীমাংসা করিবার জন্য মৌর্যরাজ অশোকের ন্যায় কণিষ্ক চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে মহাযান মতবাদ স্বীকৃত হয়। বুদ্ধদেবের সময়ে বা অশোকের সময়ে বৌদ্ধগণ বুদ্ধের সহজ সরল উপদেশ অনুসরণ করিয়া চলিতেন। কিন্তু বৈদেশিক বৌদ্ধগণ, বিশেষত ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক বৌদ্ধগণ বুদ্ধের মূর্তিপূজা প্রবর্তন করেন। ইহার নাম হয় মহাযান। মহাযান-পন্থীরা পূর্ব-পন্থীদিগকে অবজ্ঞাভরে হীনযান-পন্থী বলিত।

অনেকে মনে করেন, কণিষ্ক ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ

করেন এবং তিনিই শকাব্দের প্রবর্তক। আবার কেহ কেহ বলেন কণিষ্ক খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক।

গুপ্ত সাম্রাজ্য—প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ঃ মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের প্রায় পাঁচশত বৎসর পরে মগধে গুপ্তরাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (৩২০ খ্রীঃ পূঃ)। তিনি প্রথমে মগধের একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। পরে মগধ হইতে এলাহাবাদ ও অযোধ্যা পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়া চন্দ্রগুপ্ত 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন।

সমুদ্রগুপ্ত (৩৩০ খ্রীঃ পূঃ) ঃ চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত গুপ্তবংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন। তিনি দিগ্‌বিজয়ে বাহির হইয়া উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের বহু রাজ্য জয় করেন। তাঁহার এই দিগ্‌বিজয়ের বিবরণ এলাহাবাদের একটি স্তম্ভগাত্রে লেখা আছে। তাঁহার সভাকবি হরিষেণ এই বিবরণটি রচনা করিয়াছিলেন।



সমুদ্রগুপ্ত (বীণাবাদনরত)

সমুদ্রগুপ্ত আর্যাবর্তের বহু রাজাকে নিষ্ঠুরভাবে উচ্ছেদ করিয়া তাঁহাদের রাজ্য অধিকার করেন। পশ্চিমে যমুনা ও চম্বল নদী হইতে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পাঞ্জাব, রাজপুতানা ও মালব হইতে তিনি রাজকর পাইতেন। আসাম, পূর্ববঙ্গ, নেপাল প্রভৃতি রাজ্য তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের রাজারা গুপ্তসম্রাটের নিকট যুদ্ধে হারিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াই মুক্তি পাইয়াছিলেন। পশ্চিম-ভারতের এবং উত্তর-পশ্চিম

রাজ্য জয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ


গুপ্ত সাম্রাজ্য
০ ২০০ ৪০০
মাইল
কাশ্মীর
পুরুষপুর
ইন্দ্রপ্রস্থ
নেপাল
মথুরা
কনৌজ
বৈশালী
কাশী
প্রয়াগ
পাটলিপুত্র
চম্পা
উজ্জয়িনী
সাঁচী
বুদ্ধগয়া
গু প্ত সা ম্রা জ্য
বলভী
তাম্রলিপ্তি
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
কাঞ্চী
সিংহল
ভারত মহাসাগর

সীমান্তের শক ও কুষাণ রাজগণ এবং সিংহলের রাজা মেঘবর্ণ গুপ্ত সম্রাটকে সম্মান দেখাইয়াছিলেন। এইরূপে দিগ্‌বিজয় সমাপ্ত করিয়া সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা তাঁহার সার্বভৌম শক্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। এই অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষে যে-স্বর্ণমুদ্রা মুদ্রিত হইয়াছিল তাহার একদিকে অশ্বের মূর্তি অঙ্কিত রহিয়াছে।

হরিষেণের প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্তের চরিত্র বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি যে কেবল 'শতযুদ্ধবিজয়ী বীর' ছিলেন তাহা নহে, তিনি কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি যে সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন তাহা তাঁহার মুদ্রা হইতেও প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহার একটি মুদ্রায় দেখা যায় যে, তিনি সিংহাসনে বসিয়া বীণা বাজাইতেছেন। সমুদ্রগুপ্ত দীন, অনাথ ও আতুর প্রভৃতি জনগণকে দয়া করিতেন; পরাজিত শত্রুর প্রতি অনুকম্পা দেখাইতেন। যাঁহারা তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইতেন তিনি তাঁহাদের রাজ্য ও সম্পদ্ তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দিতেন। তাঁহার বুদ্ধি শাণিত ছিল; শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ছিল। তাঁহার সভায় অনেক বড় বড় পণ্ডিত থাকিতেন; তাঁহাদের সহিত তিনি শাস্ত্র আলোচনা করিতেন।

চরিত্র ও মহানুভবতা

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত: সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন। গল্প ও উপকথায় উজ্জয়িনীরাজ 'শকারি'



দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা

বিক্রমাদিত্যের নাম বিখ্যাত। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই সেই বিক্রমাদিত্য। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পশ্চিম ভারতের শকরাজদিগকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদের রাজধানী উজ্জয়িনী

শকারি বিক্রমাদিত্য ও নবরত্ন

অধিকার করেন। এই উজ্জয়িনী বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল। গল্প আছে, বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় নবরত্ন বা নয়জন বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন; শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিলেন কবি কালিদাস। কবি কালিদাসের বর্ণনা হইতে রাজধানী উজ্জয়িনীর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়।

স্কন্দগুপ্ত ঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র কুমারগুপ্ত একচল্লিশ বৎসর ধরিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্য শাসন করেন। কুমারগুপ্তের পর তাঁহার পুত্র স্কন্দগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে হূণ নামক মধ্য-এশিয়ার এক দুর্ধর্ষ জাতি গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। কিন্তু স্কন্দগুপ্ত তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া তাড়াইয়া দেন। স্কন্দগুপ্তের পর গুপ্তবংশে আর কোন শক্তিশালী রাজার আবির্ভাব হয় নাই। এই সময়ে হূণগণ পুনঃপুনঃ ভারত আক্রমণ করে। তাহাদের আক্রমণে গুপ্তরাজারা হীনবল হইয়া পড়েন। কিন্তু হীনবল হইয়াও তাঁহারা অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত মগধে রাজত্ব করেন।

হূণ শক্তির নিধন

অনুশীলনী

১। বৈদিকযুগের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

২। বৈদিক সাহিত্য ও ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩। গৌতম বুদ্ধের জীবনী ও ধর্মমত সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৪। মহাবীর কে ছিলেন? তিনি কোন্ ধর্ম প্রচার করেন?

৫। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

৬। সম্রাট অশোকের ধর্মপ্রচার ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখ।

৭। সম্রাট কণিষ্কের রাজ্যজয় ও তাঁহার রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্মের প্রসার সম্পর্কে আলোচনা কর।

৮। সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যজয় ও কৃতিত্ব সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৯। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন :

১। বেদ কয়ভাগে বিভক্ত ? প্রাচীন মহাকাব্যদ্বয়ের নাম কি ? মহাকাব্যদ্বয় ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনধারাকে কিভাবে প্রভাবান্বিত করে ?

২। বৈদিক যুগের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কি জান ?

৩। আর্যদের আদি বাসভূমি কোথায় ছিল ?

৪। বৈদিক সমাজে নারীর ভূমিকা কি ছিল ?

৫। বৈদিক সমাজ কি কি বর্ণে বিভক্ত ছিল ?

৬। কি কারণে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি হইয়াছিল ?

৭। জৈন ধর্মমত কি ছিল ?

৮। কি কারণে চন্দ্রগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত রাজবংশকে মৌর্যবংশ বলা হয় ?

৯। সম্রাট অশোক কোন্ রাজ্য জয় করিয়া অনুশোচনাগ্রস্ত হইয়াছিলেন ?

১০। অশোককে কেন শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলা হয় ?

১১। কোন্ সম্রাটের রাজত্বকালে মহাযান মত স্বীকৃতিলাভ করিয়াছিল ? মহাযান ও হীনযানদের মধ্যে তফাত কি ?

১২। স্কন্দগুপ্ত কে ছিলেন ?

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। ভারতীয় আর্যদের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সাহিত্যের নাম —।

২। — এই তিন বর্ণের জীবন — আশ্রমে বিভক্ত ছিল।

৩। — এই দুইখানি হিন্দুদের প্রাচীন মহাকাব্য।

৪। সমস্ত ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছিলেন বলিয়া মহাবীরের আর এক নাম —।

৫। যে-গাছের তলায় বসিয়া বুদ্ধদেব দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন সেই গাছের নাম হইল —।

৬। লোভ ও আকাঙ্ক্ষা হইতে মুক্তি পাইবার নাম —।

৭। — মৌর্য সম্রাটগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

৮। অশোক তাঁহার প্রজাদিগকে — মত দেখিতেন।

৯। তৃতীয় কুষাণ সম্রাট — কুষাণ বংশের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত রাজা ছিলেন।

১০। — গুপ্তবংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন।

১১। হরিষেণের প্রশস্তিতে — চরিত্র বর্ণনা করা হইয়াছে।

১২। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত — উপাধি গ্রহণ করেন।

১৩। মৌর্যোত্তর যুগে — শিল্পরীতির প্রভাবে ভারতীয় শিল্পরীতি খুবই উন্নত হইয়াছিল।

সপ্তদশ অধ্যায়

বঙ্গদেশ

প্রাচীন বঙ্গদেশ ঃ প্রাচীনকালে বঙ্গদেশের বিভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল। তখন বঙ্গদেশ নামে কোন একটি সমগ্র দেশের অস্তিত্ব ছিল না। মধ্যবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের নাম ছিল বঙ্গ, নিম্নবঙ্গের নাম ছিল সমতট, উত্তরবঙ্গকে পুণ্ড্রদেশ বা বরেন্দ্রদেশ বলিত। ইহা ছাড়া পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের কতক স্থান লইয়া গৌড়রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরকে বলা হইত রাঢ় দেশ।

বৈদিক যুগে বঙ্গদেশ ঃ বৈদিক যুগের শেষ দিকে রচিত ঐতরেয় আরণ্যক, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্র, বঙ্গ, মগধ ও চের প্রভৃতি রাজ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

মহাকাব্যের যুগে বঙ্গদেশ ঃ রামায়ণ ও মহাভারতে বঙ্গ শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। অযোধ্যার রাজা দশরথ নিজ রাজ্যের বিস্তার বর্ণনাকালে যে-কয়টি স্থানের নাম করিয়াছেন তাহার মধ্যে অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধের কথা আছে। তাছাড়া রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডেও অঙ্গ, পুণ্ড্র ও মগধের কথা আছে।

মহাভারতে গল্প আছে যে, চন্দ্রবংশে বলি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পত্নী সুদেষ্ণার পাঁচটি পুত্র জন্মে। তাঁহাদের নাম ছিল অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম। ইহারা যে যে দেশে বাস

করিতেন, সেই সেই দেশ ইহাদের নামানুসারে পরিচিত ছিল। আবার মহাভারতের সভাপর্বে ভীম যে পুণ্ড্র, বঙ্গ, সুহ্ম ও তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি স্থানগুলি জয় করিয়াছিলেন, ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

জৈন সাহিত্য গ্রন্থ আচারঙ্গ সূত্রে ব্রজভূমি ও সুহ্মভূমির উল্লেখ আছে। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ লইয়া সুহ্মভূমি গড়িয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধগ্রন্থ দিব্যাবদানেও পুণ্ড্রবর্ধনের উল্লেখ পাওয়া যায়।

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণকাল হইতে গুপ্তযুগের উত্থানকাল : গ্রীক লেখকগণ গঙ্গরিডই ও প্রাসীয়য় নামে দুইটি রাজ্যের কথা বলিয়াছেন। ইহাদের সীমারেখা সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। ডিওডোরাস গঙ্গরিডই জাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। টলেমির মতে প্রাসীয়য় রাজ্য গঙ্গানদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং তাম্রলিপ্ত ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। মৌর্যদের আমলে বঙ্গদেশ মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কুষাণ রাজগণের মুদ্রাও বঙ্গদেশে পাওয়া গিয়াছে।

চীনদেশীয় পরিব্রাজক ইৎ-সিং-এর বর্ণনা অনুসারে গুপ্তবংশের আদি পুরুষ শ্রীগুপ্ত চীনদেশীয় শ্রমণদের জন্য মৃগস্থাপন স্তূপের নিকটে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। মৃগস্থাপন সম্ভবত বরেন্দ্রভূমিতে অবস্থিত ছিল। শিলালিপি অনুযায়ী সমতট অর্থাৎ নিম্ন ও পূর্ববঙ্গ ব্যতীত প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশ সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। বাংলা যে পরবর্তী কালেও গুপ্তসাম্রাজ্যভুক্ত ছিল তাহা কুমারগুপ্তের সময়ের বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে প্রমাণিত হইয়াছে। পরে হূণ আক্রমণের ফলে গুপ্তরাজগণ দুর্বল হইয়া পড়িলে বাংলা স্বাধীন হইয়া পড়ে।

বৈদেশিক জাতির সহিত সংঘর্ষ ও সমন্বয় : প্রাচীনকালেই বহির্বিশ্বের সহিত ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। কুষাণযুগে মধ্য-এশিয়া, মিশর, রোম ও চীনের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল।

বৈদেশিক যোগাযোগের ফলে ভারতের সমাজব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল। বিদেশী রাজন্যবর্গ ও রাজপরিবার ক্ষত্রিয় আখ্যা সহ সমাজে গৃহীত হইল। ভারতীয় লোকদের সহিত বিবাহ-বন্ধন স্থাপন করিয়া অনেক বিদেশী জাতি ভারতীয় সমাজে একেবারে মিশিয়া গিয়াছিল। ফলে সংকর বর্ণের উদ্ভব হইল বটে, কিন্তু তাহারাও সমাজে স্থান পাইল।

কুষাণযুগে ভারতীয় বণিকগণ স্থলপথে ও সমুদ্রপথে ভারতের বাহিরে আরবদেশ, মিশর, তুর্কীস্থান, ইরান, চীন ও রোমের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য করিত। **পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সী** নামক পুস্তকে বর্ণিত আছে যে, একজন গ্রীক নাবিক লোহিত ও আরব-সাগরের উপকূল ধরিয়া ভারতে আসিয়াছিলেন। ভারত হইতে মুক্তা, হাতীর দাঁত, মসলা, রেশম, সাধারণ সূতীবস্ত্র ও মসলিন বিদেশে চালান যাইত। আর বিদেশ হইতে ভারতে তামা, টিন, প্রবাল, কাচ, রূপার বাসন প্রভৃতি আমদানি করা হইত।

অনুশীলনী

১। প্রাচীন বাংলা কি কি নামে পরিচিত ছিল? গুপ্তযুগের উত্থান পর্যন্ত প্রাচীন বাংলা সম্পর্কে কি জান?

২। বৈদেশিক আক্রমণ ভারতীয় সমাজকে কিভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল? ইহার ফলে কি ভারতের ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়াছিল?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন:

১। মহাকাব্যের যুগে বাংলাদেশ সম্পর্কে কোন্ কোন্ ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়?

২। জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে বাংলাদেশ সম্পর্কে কি উল্লিখিত আছে?

৩। বাংলাদেশ কি গুপ্তসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল?

৪। কুষাণযুগে কোন্ কোন্ দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১। নিম্নবঙ্গের নাম ছিল — ।

২। পশ্চিম ও — বঙ্গের কতক স্থান লইয়া গৌড় রাজ্য গঠিত হইয়াছিল।

৩। বৌদ্ধ গ্রন্থ — পুণ্ড্রবর্ধনের উল্লেখ পাওয়া যায়।

৪। — — নামক পুস্তকে বর্ণিত আছে যে একজন — নাবিক লোহিত ও আরব সাগরের উপকূল ধরিয়া ভারতে আসিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

সমাজ ও সংস্কৃতি

বৈদেশিক বিবরণ—মৌর্য ও গুপ্ত সমাজ ব্যবস্থা ঃ মৌর্যযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচীন ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে সম্যক্ ধারণা লাভ করিতে হইলে বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ পাঠ করা প্রয়োজন।

মেগাস্থিনিসের বিবরণ ঃ গ্রীকদূত মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে আমরা মৌর্য সাম্রাজ্যের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারি।

সামাজিক অবস্থা

সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে মেগাস্থিনিস লিখিয়াছেন যে, সে-সময়ে ভারতীয়গণ সাতটি জাতিতে বিভক্ত ছিল। যথা—(১) দার্শনিক, (২) কৃষক, (৩) পশুপালক ও শিকারী, (৪) শিল্পী ও ব্যবসায়ী, (৫) সৈনিক, (৬) গুপ্তচর এবং (৭) রাজমন্ত্রী ও রাজকর্মচারী। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই সাতটি জাতি শাস্ত্রবর্ণিত চারি জাতির রূপান্তর মাত্র।

এখনকার মত সেকালেও ভারতবর্ষের লোক কৃষিজীবী ছিল। কৃষকেরা সামরিক কার্য হইতে অব্যাহতি পাইত এবং যুদ্ধের সময়ও

শান্তিতে কৃষিকার্য করিত। উৎপন্ন শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ হইতে এক-চতুর্থাংশ খাজনা দিতে হইত। পশুপালক ও শিকারিগণ পশুপক্ষীর অত্যাচার হইতে কৃষিক্ষেত্র রক্ষা করিত বলিয়া রাজা তাহাদের ভরণ-পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় শস্য দিতেন। শিল্পীদিগের মধ্যে যাহারা অস্ত্রশস্ত্র ও জাহাজ নির্মাণ করিত তাহাদিগকে রাজসরকারের কাজ করিতে হইত, সরকারি কাজ ছাড়া তাহারা কোন ব্যক্তি-বিশেষের কাজ করিতে পারিত না। রাজ-কর্মচারিগণ জমি জরিপ করিত ও জলসেচনের ব্যবস্থা করিত। সে-সময় ভারতবাসী সরল ও সাধু জীবন যাপন করিত। তাহারা আহার্য সম্বন্ধে অতিশয় মিতব্যয়ী ছিল বটে, কিন্তু অলঙ্কার ও পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য বেশ খরচ করিত। লোকে মিথ্যা কথা বলিত না, মামলা-মোকদ্দমা করিত না। জল-সেচনের সুব্যবস্থা থাকায় প্রচুর শস্য জন্মিত। তখন জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্তী কালের ন্যায় ততটা কঠোর হইয়া উঠে নাই। ব্রাহ্মণেরা অন্যান্য জাতির হইয়া যজ্ঞ করিতেন এবং সমাজে তাঁহাদের বিশেষ সম্মান ছিল।

জীবিকা

জীবনযাত্রা—পোশাক-পরিচ্ছদ

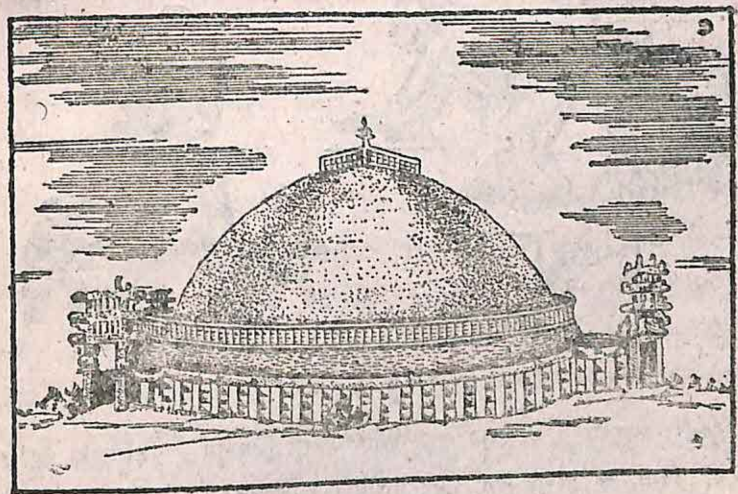
ফা-হিয়েনের বিবরণ—প্রাচীনকালে চীনদেশের অনেক বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলি দেখিবার জন্য ভারতে আসিতেন। ফা-হিয়েন নামক এইরূপ একজন তীর্থযাত্রী দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব-কালে ভারতে আসিয়াছিলেন। ৪০৫ হইতে ৪১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ছয় বৎসরকাল এদেশে বাস করিয়া তিনি পেশোয়ার, তক্ষশিলা, মথুরা, কনৌজ, কপিলবাস্তু, শ্রাবস্তী, পাটলিপুত্র, রাজগৃহ, বৈশালী প্রভৃতি নগর দর্শন করেন।

ফা-হিয়েন পাটলিপুত্রের ঐশ্বর্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। পাটলিপুত্র নগরে বহু হাসপাতাল ও বিদ্যালয় ছিল। কিন্তু তখন অন্যান্য বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলির আর তেমন মর্যাদা ছিল না। গুপ্তসম্রাটগণ সুশাসন করিতেন বলিয়া

সামাজিক অবস্থা

দস্যু-ডাকাতের উপদ্রব ছিল না ; জনসাধারণ অভাবগ্রস্ত ছিল না হিন্দু ও বৌদ্ধগণ পাশাপাশি শান্তিতে বাস করিত, ধর্ম লইয়া পরস্পরের বিদ্বেষভাব ছিল না। ফা-হিয়েন লিখিয়াছেন যে, পরাক্রান্ত রাজার সুশাসনে দেশে সুখ-শান্তি, ঐশ্বর্য বিরাজ করিত। রাজপুরুষেরা লোকের জীবনযাত্রায় হস্তক্ষেপ করিতেন না। রাজকর অতি সামান্য ছিল। মৌর্য আমলে অপরাধের জন্য যেমন কঠোর শাস্তি দেওয়া হইত, এই সময় তাহা অনেক কমিয়া গিয়াছিল। বাণিজ্যের খুব উন্নতি হইয়াছিল এবং সেই সঙ্গে দেশের ধনসম্পদও যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছিল।

প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলা ঃ হরপ্পায় আবিষ্কৃত প্রত্নসামগ্রীর মধ্যেই ভারতীয় শিল্পকলার সর্বপ্রাচীন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পরেই মৌর্যযুগের শিল্পকলা। হরপ্পার যুগ হইতে মৌর্যযুগের পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত কোন শিল্পকলার নিদর্শন আজও আবিষ্কৃত হয় নাই।

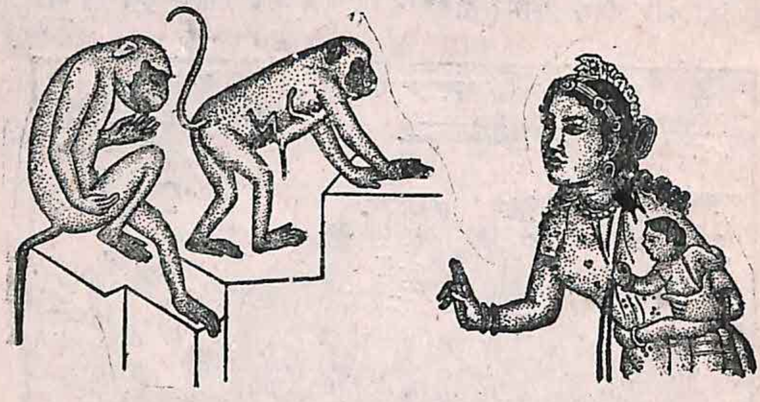


সাঁচী স্তূপ

অশোকের প্রস্তর নির্মিত বিরাট প্রাসাদ, ভারতের বিভিন্ন স্থানে নির্মিত প্রস্তরস্তম্ভ, ভারুত ও সাঁচীর স্তূপ এবং গয়ার নিকটস্থ 'আজবক গুহা'সমূহ মৌর্যযুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন।

মৌর্যোত্তর যুগে গ্রীক ও রোমান শিল্পরীতির প্রভাবে ভারতীয় শিল্পরীতি খুবই উন্নত হইয়াছিল। কুষাণ যুগের ভাস্করগণ গ্রীক আদর্শের অনুকরণে পাথর কুঁদিয়া বুদ্ধদেবের মূর্তি গড়িতে আরম্ভ করেন। ইহা গান্ধার শিল্প নামে পরিচিত। গান্ধার অঞ্চলে এবং তক্ষশিলার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এইরূপ বহু বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। এদিকে গান্ধার শিল্পের পাশাপাশি দেশীয় শিল্পরীতিও খুব উন্নত হইয়াছিল।

গুপ্তযুগে ভারতীয় শিল্পকলার অভূতপূর্ব বিকাশ হইয়াছিল, মধ্য-ভারতের এবং উড়িষ্যার গুহাগুলির গঠন-কৌশল অপূর্ব। উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসী জেলার অন্তর্গত দেওগড়ের প্রস্তর-নির্মিত দশাবতার মন্দির ও কানপুর জেলার ভিতরগাওয়ের ইষ্টক-নির্মিত মন্দির ও মন্দির-গাত্রের



অজন্তা গুহার চিত্র

মূর্তিগুলি গুপ্তযুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মন্দিরে প্রাপ্ত শিব, বিষ্ণু ও অপরাপর দেবদেবীর পাথরের মনোরম মূর্তিগুলি সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। এ-ছাড়া অজন্তা গুহার চিত্রাবলীর মধ্যে অনেকগুলি চিত্র গুপ্তযুগের সৃষ্টি।

প্রাচীন সাহিত্যঃ ভারতের সুপ্রাচীন সাহিত্য বলিতে বৈদিক সাহিত্য প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। বৈদিক যুগে রচিত স্তব-স্তুতি ও

মন্ত্রাদি সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ। এ-ছাড়া রামায়ণ ও মহাভারত যথেষ্ট উচ্চমানের সাহিত্য হিসাবে আজিও সমাদৃত। মৌর্যযুগে ভদ্রবাহুর 'কল্পসূত্র', ও বৌদ্ধগ্রন্থ 'কথাবত্ত' রচিত হইয়াছিল।

মৌর্যোত্তর যুগে রচিত অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত'-এ সংস্কৃত কাব্যের উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। এ-ছাড়া গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা' এবং সম্ভবত মহাকবি ভাসের নাট্যসমূহ এ-যুগেরই সৃষ্টি।

গুপ্তযুগে সংস্কৃত সাহিত্যের অভূতপূর্ব উন্নতি হইয়াছিল। এই যুগে বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও কবির আবির্ভাব হয়, তন্মধ্যে মহাকবি কালিদাস সম্ভবত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন। কালিদাস রচিত 'কুমারসম্ভব', 'শকুন্তলা', 'মেঘদূত', 'রঘুবংশ', 'বিক্রমোর্বশী' প্রভৃতি কাব্য ও নাটক শুধু সংস্কৃত সাহিত্যেরই নয়, বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের রচয়িতা শূদ্রক ও 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকের প্রণেতা বিশাখদত্তও সম্ভবত গুপ্তযুগেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

শিক্ষা : বৈদিক যুগে বর্ণাশ্রম প্রথা অনুযায়ী সমাজে উচ্চবর্ণের মধ্যে শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল। ছাত্রদের ব্রহ্মচর্য পালন করিতে হইত এবং গুরুগৃহে গিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইত। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পর বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ শিক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করিতেন। ক্রমে শিক্ষার ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয় এবং মৌর্যযুগে শিক্ষার বহুল প্রচলন ছিল। ফলে শিক্ষা আর ব্রহ্মচারীদের মধ্যে বা গুরুগৃহে সীমাবদ্ধ রহিল না। অনেক বড় বড় শিক্ষাকেন্দ্র গড়িয়া উঠিল।

মৌর্যোত্তর যুগে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির সর্বপ্রধান কেন্দ্র। বৌদ্ধ জাতকের গল্পেও তক্ষশিলার উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত রাওলপিণ্ডির নিকটে তক্ষশিলা অবস্থিত ছিল। দেশ-বিদেশ হইতে হাজার হাজার ছাত্র আসিয়া এখানে বেদ, ব্যাকরণ, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যয়ন করিত। পরবর্তী

কালে সোমপুরী, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুর বিহারসমূহ ও সর্বোপরি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতির প্রসার হইয়াছিল।

হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় খ্যাতি ও গৌরবের চরমে উঠিয়াছিল। দেশ-দেশান্তর হইতে শিক্ষার্থীর দল এখানে জ্ঞানার্জনের জন্য আসিতেন। হর্ষের সময় নালন্দায় ছাত্র-সংখ্যা ছিল দশ হাজার। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ এখানে দুই বৎসর শিক্ষালাভ করেন।

বিজ্ঞান: গুপ্তযুগে জ্যোতির্বিদ্যার খুব উন্নতি হইয়াছিল। হিন্দু জ্যোতির্বিদগণ জানিতেন যে, গ্রহনক্ষত্রগুলি গোলাকার, পৃথিবীর আহ্নিক গতি আছে এবং সূর্য স্থির ও পৃথিবী ঘুরিতেছে। ব্রহ্মগুপ্ত বলিয়াছেন, "সমস্ত জিনিস প্রাকৃতিক নিয়মে পৃথিবীতে পতিত হয়, কারণ পৃথিবীর ধর্ম হইল সমস্ত জিনিসকে আকর্ষণ করা ও ধরিয়া রাখা।" কিন্তু জ্যোতিষে হিন্দুরা গ্রীকদের নিকট ঋণী। বরাহমিহির বলিয়াছেন,

জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতশাস্ত্র

"গ্রীকেরা যবন, কিন্তু তাঁহারা জ্যোতিষশাস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেইজন্য তাঁহাদিগকে ঋষির মত সম্মান করিতে হইবে।" বরাহমিহির ছিলেন এযুগের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ্ এবং তাঁহার রচিত 'সূর্য-সিদ্ধান্ত' বিজ্ঞান জগতে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করে। এ-ছাড়া প্রসিদ্ধ গণিতশাস্ত্রবিদ্ আর্যভট্ট এই যুগেই জন্মগ্রহণ করেন এবং পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি নির্ণয় করিয়া খ্যাতিলাভ করেন। তিনি ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

রসায়ন চর্চা: কুষাণযুগে পণ্ডিত নাগার্জুন রসায়নশাস্ত্র চর্চা করিতেন এবং তিনি পারদের ব্যবহার জানিতেন। গুপ্তযুগে ভারত রসায়ন বিদ্যায় উন্নত ছিল, দিল্লীর সুবিখ্যাত লৌহস্তম্ভই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাহা ছাড়া হিন্দুরা গাছগাছড়া হইতে এবং পারদ ও অন্যান্য ধাতু হইতে বিভিন্ন ঔষধ প্রস্তুত করিত।

চিকিৎসা বিদ্যা: অথর্ববেদে ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের সূচনা

দেখিতে পাওয়া যায়। অতঃপর বিম্বিসারের রাজত্বকালে ভেষজবিদ্ জীবকের আবির্ভাব হয়। জীবক প্রাচীন তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ুর্বেদ বিদ্যা অর্জন করেন। পরে তিনি পাটলিপুত্রে চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন।

চিকিৎসা বিদ্যা

প্রাচীন অস্ত্র চিকিৎসা বিশারদ্ হিসাবে সুশ্রুতের নাম আজও স্মরণীয়। তিনি অস্ত্রোপচার করিয়া প্লীহা ছেদন এবং গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ করাইতে পারিতেন। চিকিৎসা বিদ্যায় হিন্দুরা খুবই উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কুষাণ যুগে বিখ্যাত আয়ুর্বেদ গ্রন্থ প্রণেতা চরক আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের উন্নতি করেন। গুপ্তযুগে চিকিৎসকগণ পশুর মৃতদেহ কাটিয়া শারীরচ্ছেদ বিদ্যা শিখিত। কাঠের ছাঁচের মধ্যে মোম ঢালিয়া তাহারা মনুষ্যমূর্তি গড়িত এবং সেই মূর্তি ছেদন করিয়া শিক্ষার্থীরা শারীরচ্ছেদ বিদ্যা শিখিত। হিন্দুদের নিকট হইতে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া গ্রীক ও আরবগণ চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নতি করেন।

অনুশীলনী

১। মেগাস্থিনিসের বিবরণ অনুযায়ী মৌর্যযুগের ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে কি জানা যায়?

২। ফা-হিয়েন কে ছিলেন? তিনি কখন ভারতে আসেন? ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে তিনি কি লিখিয়াছেন?

৩। প্রাচীন যুগ হইতে গুপ্তযুগ পর্যন্ত ভারতের শিল্প, স্থাপত্য ও চারুকলা সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৪। প্রাচীন ভারতের শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখ।

৫। প্রাচীন ভারতে রসায়ন শাস্ত্র ও চিকিৎসা বিদ্যার উন্নতি সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। মেগাস্থিনিস কে ছিলেন? তিনি ভারতীয় সমাজকে কয়ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন?

২। ফা-হিয়েন কোথা হইতে ভারতে আসিয়াছিলেন? তাঁহার কি উদ্দেশ্য ছিল এবং কোন্ সম্রাটের রাজত্বকালে তিনি ভারতভ্রমণ করেন?

৩। কোন্ সময়ে সাঁচী স্তূপ নির্মিত হইয়াছিল?

৪। কোন্ বংশের রাজত্বকালে অজন্তা গুহার চিত্রগুলি অঙ্কিত হইয়াছিল?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১। — আবিষ্কৃত প্রত্নসামগ্রীর মধ্যেই ভারতীয় শিল্পকলার — নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।

২। কুষাণ যুগের ভাস্করগণ — আদর্শের অনুকরণে পাথর কুঁদিয়া বুদ্ধদেবের মূর্তি গড়িতেন।

৩। ভারতের সুপ্রাচীন সাহিত্য বলিতে — সাহিত্য প্রথমেই উল্লেখযোগ্য।

৪। মৌর্যোত্তর যুগে রচিত —'র 'বুদ্ধচরিত'—এ সংস্কৃত কাব্যের উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়।

৫। মহাকবি কলিদাস সম্ভবত — সমসাময়িক ছিলেন।

৬। মৌর্যোত্তর যুগে — বিশ্ববিদ্যালয় ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র।

৭। জ্যোতিষে হিন্দুরা — নিকট ঋণী।

৮। গুপ্তযুগে ভারত রসায়নবিদ্যায় উন্নত ছিল, দিল্লীর সুবিখ্যাত — ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

৯। — ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়।

১০। প্রাচীন অস্ত্র-চিকিৎসা বিশারদ হিসাবে — নাম আজও স্মরণীয়।
